বাঙ্‌লায় বালক-বালিকাদের উপযোগী কোনও গদ্য-পদ্যময় আবৃত্তি-সঙ্কলন নাই। সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য "আবৃত্তি-মঞ্জুষা"য় কতকগুলি কবিতা ও গদ্যরচনা সঙ্কলিত হইল। আবৃত্তির জন্য যে সকল কবিতা ও গদ্যাংশ এই পুস্তকে নির্ব্বাচিত হইয়াছে সেগুলি যাহাতে সকল বয়সের বালক-বালিকাদের উপযোগী হয় সেদিকে আমরা বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছি। ইহাতে হাস্য-রস-প্রধান, করুণরস-প্রধান, কাহিনীমূলক এবং উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক কবিতা ও গদ্য রচনা চয়ন করা হইয়াছে।

বঙ্গের সাহিত্য-কাননে আবৃত্তির উপযোগী অনেক সুন্দর সুরভি-কুসুম আছে। কিন্তু পুস্তকের আকারের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে গিয়া আমাদের বহু কবিতা ও গদ্য রচনা ত্যাগ করিতে হইয়াছে—ইহাতে সকল লেখক লেখিকার মালঞ্চ হইতে কুসুমচয়ন করা সম্ভব হয় নাই। তবে বাঙ্‌লার অধিকাংশ খ্যাতনামা কবি ও গদ্য রচয়িতাগণের রচনা এই সংগ্রহে মুদ্রিত হইল। এক্ষণে ইহা বালক-বালিকাদের নিকট সমাদর লাভ করিলে আমরা আমাদের সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

"আবৃত্তি-মঞ্জুষার" বিষয় নির্ব্বাচনে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতি কবিগণ বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। যে সকল লেখক লেখিকার রচনা এই পুস্তকে গৃহীত হইয়াছে তাঁহাদের সকলকে ও তাঁহাদের প্রকাশকদিগকেও আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ নিবেদন করিতেছি।

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

সূচী

কবিতা

গদ্য

কবিতা

রামের বিলাপ

চেতনা পাইয়া নাথ কহিলা কাতরে ;—
রাজ্য ত্যজি, বনবাসে নিবাসিনু যবে,
লক্ষ্মণ, কুটীরদ্বারে, আইলে যামিনী,
ধনুঃ করে, হে সুধন্বি, জাগিতে সতত
রক্ষিতে আমায় তুমি ; আজি রক্ষঃপুরে—
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি-মাঝে আমি,
বিপদ্-সলিলে মগ্ন ; তবুও ভুলিয়া
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে
বিরাম ? রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে ?
উঠ, বলি ! কবে তুমি বিরত পালিতে
ভ্রাতৃ-আজ্ঞা ? তবে যদি মম ভাগ্যদোষে—
চিরভাগ্যহীন আমি—ত্যজিলা আমারে,
প্রাণাধিক, কহ, শুনি, কোন্ অপরাধে
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী ?
দেবর লক্ষ্মণে স্মরি রক্ষঃ কারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি। কেমনে ভুলিলে—
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি,
মাতৃসম নিত্য যারে সেবিতে আদরে !
হে রাঘবকুলচূড়া, তব কুলবধূ,
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয় ? না শাস্তি' সংগ্রামে

হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শয়ন—বীরবীর্য্যে সর্ব্বভুক্‌সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি ? উঠ, ভীমবাহু,
রঘুকুলজয়কেতু ! অসহায় আমি
তোমা বিনা, যথা রথী শূন্যচক্র রথে !
তোমার শয়নে হনূ বলহীন, বলি,
গুণহীন ধনুঃ যথা ; বিলাপে বিষাদে
অঙ্গদ, বিষণ্ণ মিতা সুগ্রীব সুমতি,
অধীর কর্ব্বুরোত্তম বিভীষণ রথী,
ব্যাকুল এ বলীদল। উঠ, ত্বরা করি,
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি!
কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্দ্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,—
অভাগিনী ! নাহি কাজ বিনাশি' রাক্ষসে।
তনয়-বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূ-তীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ, আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর ? কি কহিব, শুধিবেন যবে
মাতা, 'কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি

আমার, অনুজ তোর ?' কি ব'লে বুঝাব
ঊর্ম্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে ?
উঠ, বৎস ! আজি কেন বিমুখ হে তুমি
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে,
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে।
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন, মুছিতে যতনে
অশ্রুধারা ; তিতি এবে নয়নের জলে
আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে,
প্রাণাধিক ? হে লক্ষ্মণ, এ আচার কভু,
(সুভ্রাতৃবৎসল তুমি বিদিত জগতে !)
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি
আমার ! আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি',
পূজিনু দেবতাকুলে,—দিলা কি দেবতা
এই ফল ? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি,
শিশির-আসারে নিত্য সরস' কুসুমে,
নিদাঘার্ত্ত, প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে !
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু ; বিতর
জীবনদায়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে—
বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।"

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

সীতা ও সরমা

[অশোকবনে সীতার পদপ্রান্তে সরমা উপবিষ্টা]

সীতা—হিতৈষিণী সীতার পরমা
তুমি, সখি! পূর্ব্বকথা শুনিবারে যদি
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মনঃ দিয়া।—
ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে; ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্ত্যে সুর-বন-সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,
কিসের অভাব তার? যোগাতেন আনি
নিত্য ফল মূল বীর সৌমিত্রি; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু; কিন্তু জীব-নাশে
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,—
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে!
ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ! রাজার নন্দিনী,
রঘু-কুল-বধূ আমি; কিন্তু এ কাননে,
পাইনু সরমা সই, পরম পিরীতি!
কুটীরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে?

পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি !
জাগা'ত প্রভাতে মোরে কুহরি সুস্বরে
পিক-রাজ ! কোন্ রাণী, কহ, শশিমুখী,
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে
খোলে আঁখি ? শিখী সহ, শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর। নর্ত্তক নর্ত্তকী,
এ দোঁহের সম, রামা, আছে কি জগতে ?
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর-শিরে ;
অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে,
মহাদরে ; পালিতাম পরম যতনে,
মরুভূমে স্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা,
আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে।
সরসী আরসি মোর ! তুলি কুবলয়ে,
(অতুল-রতন-সম) পরিতাম কেশে ;
সাজিতাম ফুল-সাজে ; হাসিতেন প্রভু,
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে।
হায়, সখি, আর কিলো পাব প্রাণনাথে ?

আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে
দেখিবে সে পা ছুখানি—আশার সরসে
রাজীব ; নয়নমণি ? হে দারুণ বিধি,
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে ?

[চক্ষে বস্ত্রাঞ্চল প্রদান করিয়া সীতাদেবী অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন]

সরমা—স্মরিলে পূর্ব্বের কথা ব্যথা মনে যদি
পাও, দেবি, থাক্ তবে ; কি কাজ স্মরিয়া ?
হেরি তব অশ্রুবারি ইচ্ছি মরিবারে।

সীতা—এ অভাগী, হায়, লো সুভগে,
যদি না কাঁদিবে তবে কে আর কাঁদিবে
এ জগতে ? কহি, শুন, পূর্ব্বের কাহিনী।
পঞ্চবটী-বনে মোরা গোদাবরী-তটে
ছিনু সুখে ! হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব
সে কান্তার-কান্তি আমি ? সতত স্বপনে
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে ;
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুর-বালা-কেলি
পদ্মবনে ; কভু সাধ্বী ঋষি-বংশ-বধূ
সুহাসিনী, আসিতেন দাসীর কুটীরে,
সুধাংশুর অংশু যেন অন্ধকার ধামে !
অজিন, (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে !)

পাতি' বসিতাম কভু দীর্ঘ তরু-মূলে,
সখী-ভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা
কুরঙ্গিণী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি।
নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরু-সহ, চুম্বিতাম, মঞ্জরিত যবে
দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি
নাতিনী বলিয়া সবে! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী-জামাই বলি' বরিতাম তারে!
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত উপরে, সখি, বসিতাম আমি
নাথের চরণ-তলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে; কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে? কব বা কেমনে?
শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবাসী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরীসনে,

আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে ;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি,
নানা কথা ! এখনও, এ বিজন বনে,
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী !—
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি,
সে সঙ্গীত ?

[বিষাদে সীতাদেবী নীরব হইলেন]

সরমা—শুনিলে তোমার কথা রাঘব-রমণি,
ঘৃণা জন্মে রাজ-ভোগে। ইচ্ছা করে, ত্যজি'
রাজ্য-সুখ, যাই চলি' হেন বন-বাসে !
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে
সে কিরণ ; নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে !
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি,
কেননা হইবে সুখী সর্ব্বজন তথা,
জগত-আনন্দ তুমি, ভুবন-মোহিনী !

—মাইকেল মধুসূদন দত্ত

দধীচির আত্মত্যাগ

উঠি' তপোধন
সশিষ্যে, সম্ভ্রমে সুখে অতিথি সম্ভাষি',
যোগাইলা মৃগচর্ম্ম—পবিত্র আসন।
জিজ্ঞাসিলা সুশীতল গম্ভীর বচনে
"আশ্রমে কি হেতু গতি? কিবা অভিলাষ?"
কে পারে আনিতে মুখে, সে নিষ্ঠুর বাণী—
কে পারে চাহিতে অন্যে প্রাণ ভিক্ষাদান,
না পেয়ে হৃদয়ে ব্যথা? কে হেন দারুণ
প্রাণীমাঝে?—নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ পুরন্দর!

হেরি ঋষি, ক্ষণকালে, ধ্যানেতে জানিলা
অতিথির অভিলাষ; গদ-গদ-স্বরে
মহানন্দে তপোধন কহিলা তখন,
"পুবন্দর, শচীকান্ত!—কি সৌভাগ্য মম,
জীবন সার্থক আজি, পবিত্র আশ্রম!
এ জীর্ণ পঞ্জর-অস্থি পঞ্চভূতে ছার
না হ'য়ে, অমরোদ্ধারে নিয়োজিত আজি!
হা দেব, এ ভাগ্য মম স্বপ্নেরও অতীত!"

এতেক কহিয়া ধীরে মহাতপোধন,—
শুদ্ধচিত্তে পট্টবস্ত্র, উত্তরীয় ধরি,

গায়ত্রী গম্ভীর স্বরে উচ্চারি সঘনে,
আইলা অঙ্গন-মাঝে, কৈলা অধিষ্ঠান
সুনিবিড়, সুশীতল, পল্লবশোভিত
শতবাহু বটমূলে। আনি যোগাইলা
সাশ্রুনেত্রে শিষ্যবৃন্দ, আকুলহৃদয়,
যোগাসন গাঙ্গেয় সলিল সুবাসিত।
জ্বালিলা চৌদিকে ধূপ, অগুরু, গুগ্‌গুল্,
সর্জরস, সুগন্ধিত কুসুমের স্তর
চর্চ্চিত চন্দনরসে রাখিলা চৌদিকে,
মুনীন্দ্রে তাপসবৃন্দ মাল্যে সাজাইলা।
বসিলা ধীমান্—আহা, ললিত দৃষ্টিতে
দয়ার্দ্র হৃদয় যেন প্রবাহে বহিছে!
চাহি' শিষ্যকুল মুখ, মধুর সম্ভাষে
কহিলেন অশ্রুধারা মুছায়ে সবার,
সুধাপূর্ণ বাণী ধীরে ধীরে,—"কি কারণ,
হে বৎসমণ্ডলি, হেন সৌভাগ্যে আমার
কর সবে অশ্রুপাত? এ ভব-মণ্ডলে
পরহিতে প্রাণ দিতে পায় কতজন!
হে ক্ষুব্ধ তাপসবৃন্দ, হে শিষ্যমণ্ডলি,
জগৎ-কল্যাণ হেতু নরের সৃজন,

নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্ম্ম পালনে,
নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ এ জগতীতলে।"

আরম্ভিলা তারস্বরে চতুর্ব্বেদ গান,
উচ্চে হরিসঙ্কীর্ত্তন মধুর গম্ভীর,
বাষ্পাকুল শিষ্যবৃন্দ—ধ্যানমগ্ন ঋষি
মুদিলা নয়নদ্বয় বিপুল উল্লাসে।
মুনিশোকে অকস্মাৎ অচল পবন,
তপনে মৃদুল রশ্মি স্নিগ্ধ নভস্তল,
সমূহ অরণ্য ভেদি' সৌরভ উচ্ছ্বাস,
বন লতা তরুকুল শোকে অবনত!

দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল,
নাসিকা নিঃশ্বাস-শূন্য, নিস্পন্দ ধমনী,
বাহিরিল ব্রহ্মতেজ ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটি'
নিরুপম জ্যোতিঃপূর্ণ—ক্ষণে শূন্যে উঠি'
মিশাইল শূন্যদেশে। বাজিল গম্ভীর
পাঞ্চজন্য—হরিশঙ্খ, শূন্যদেশ জুড়ি'
পুষ্পাসার বরষিল মুনীন্দ্রে আচ্ছাদি!—
দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ

অতীত নিশার্দ্ধ ; মহা উৎসবের শেষে
পিতার চরণে বুদ্ধ হইয়া বিদায়
চলিল আপন পুরে, দেখিতে দেখিতে
সেই শান্ত নীলাকাশে লেখা নিয়তির ;
দাঁড়ায়ে অলিন্দে দেখিলেন, দেবগণ
নীলাকাশে নতকায় পূজিছে তাঁহায়
প্রীতিপুষ্পে, মেলি' শত তারকা-নয়ন
অপেক্ষিছে প্রীতিভরে তাঁর নিষ্ক্রমণ !
পুষ্যা নক্ষত্রের সহ মিশি' সুধাকর
করিয়াছে মহাযোগ পুণ্য প্রীতিময়,
গাইছে অনন্ত বিশ্ব প্রীতির সঙ্গীত,
কহিতেছে এক কণ্ঠে—"এই তো সময় !"
সুষুপ্ত 'ছন্দক' ভৃত্যে করি' জাগরিত,
কহিল— "ছন্দক ! যাও, আন' ত্বরা করি'
সজ্জিত করিয়া অশ্ব 'কণ্টক' আমার।
আগত সময় মম, সিদ্ধ মনোরথ।"
স্বপ্নে যেন বজ্রাঘাত হইল মস্তকে,—
বিস্ময়ে ছন্দক কহে—"কহ যুবরাজ !
কোথায় যাইবে এই নিশীথ সময়ে ?"
"ছন্দক !"—সিদ্ধার্থ ধীরে কহিলা গম্ভীরে—

"আজন্ম আমার প্রাণ যেই পিপাসায়
কাতর, জুড়াতে সেই পিপাসা আমার
জুড়াইতে মানবের, জুড়াতে আমার
জরা-মরণের দুঃখ, করিতে সাধন
জগতের শিব শান্তি, করিতে পূরণ
জীবনের স্বপ্ন, আজি ত্যজিব ভবন।"
এইবার স্বপ্ন নহে, পড়িল জাগ্রতে
ছন্দকের শিরে বজ্র, কহিল কাতরে—
"হেন নিদারুণ কথা আনিও না মুখে
যুবরাজ! এই দেহ মৃণাল-কোমল,—
এ কি যোগ্য তপস্যার? শিরীষ-কুসুম
সহিবে কি দাবানল? কর পরিত্যাগ
এই দুরাকাঙ্ক্ষা; হায়, আশ্রিত আমরা—
কর' রক্ষা আমাদের, দয়াবান্ তুমি।"
"ছন্দক!" সিদ্ধার্থ খেদে করিলা উত্তর—
"কে সাধে এমন পত্নী প্রেম-নির্ঝরিণী,
সদ্যোজাত প্রাণ-পুত্র, পিতা স্নেহময়,
মাতা প্রজাবতী, মাতৃপ্রেম-ভাগীরথী,
পারে ত্যজিবারে? ত্যজে প্রজা পুত্রোপম?
কিন্তু পত্নী, পুত্র, পিতা, মাতা, প্রজাগণ,

অনন্ত মানব-জাতি জন্ম-জন্মান্তরে
সবে জরা-মরণের দুঃখ ঘোরতর
কেমনে সহিবে বল ? নাহি অন্বেষিয়া
নরের উদ্ধার-পথ, পুড়াব স্বজন
জ্বালি' বিলাসের বহ্নি ?—এ ত নহে প্রেম !
প্রেম শিব, প্রেম শান্তি, প্রেম নিবারণ !
না ছন্দক ! ত্যজি' গৃহ যাব তপস্যায়।"
"ছন্দক ! ছন্দক !" যুবা কহিলা উচ্ছ্বাসে—
"অসার সম্ভোগ-সুখ অনিত্য অধ্রুব,
চঞ্চল চপলা-মত, রিক্তমুষ্টি-সম
অসার, অস্থায়ী জল-বুদ্‌বুদের মত,
দুর্ভোগ্য স্বপন-সম, দুস্পৃশ্য সফণ
সর্প-মস্তকের মত পূর্ণ মহাবিষে।
কে বল' কখনো, কাম্য বস্তু উপভোগে
—কামিনী, কাঞ্চনে, রাজ্যে—তৃপ্তি কামনার
পাইয়াছে এ জগতে ? হায় ! এ সম্ভোগ
মৃগতৃষ্ণিকার মত বাড়ায় পিপাসা,
অতৃপ্ত কামনানলে দহে—নিরবধি !
কই তৃপ্তি কোথা ? ভোগ-পুষ্পে-পুষ্পে—
মত্ত মধুকর-মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া

অতৃপ্ত কামনানলে মরিতে পুড়িয়া
এসেছি কি ধরাতলে ? মানব-জীবনে
নাহি শান্তি ? নাহি সুখ ? মানব-জীবন
কেবল কি মরীচিকা ভোগ-কামনার ?
না ছন্দক ;—আছে শান্তি, আছে নিত্য সুখ,
ভোগ-দাবানল হ'তে হইতে উদ্ধার,
জন্ম-জরা-মরণের দুঃখ-পারাবার
হইতে উত্তীর্ণ, হায়, আছে মুক্তি-পথ !
খুঁজিব সে মুক্তিপথ, খুঁজিব নির্ব্বাণ,
এই দাবাগ্নির ধারা করিব শীতল !
আন' অশ্ব ! হও তুমি সহায় আমার !

ছন্দক কাঁদিয়া কহে—"হায় দেব ! তবে
নিশ্চয় কি এ সংসার শোকে ডুবাইয়া
যাইবে ছাড়িয়া তুমি ?"

"নিশ্চয় ছন্দক !"
উত্তরিলা দৃঢ়কণ্ঠে কুমার—"নিশ্চয় !
সুমেরুর মত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আমার।
মস্তক-উপরে বজ্র তপ্ত-লৌহ-পথে,
প্রজ্বলিত শৈলশৃঙ্গ হয় নিপতিত,
তথাপি প্রতিজ্ঞা নাহি করিব লঙ্ঘন।

শত পত্নী, শত পুত্র, শত মাতা পিতা
দাঁড়ায় সম্মুখে যদি, শত মায়া-বলে
করে অবরুদ্ধ পথ, ছন্দক ! প্লাবিত
করে নয়নের জলে, পূর্ণ হাহাকারে,
তথাপি প্রতিজ্ঞা আমি পালিব নিশ্চয় ।”
আর না,—আনিতে অশ্ব চলিল ছন্দক ।
পশিলা সিদ্ধার্থ গৃহে জনমের মত
দেখিতে গোপার নব প্রসূনের মুখ ।
সূতিকা-আগারে ধীরে করিয়া প্রবেশ
দেখিলা জ্বলিছে মৃদুমন্দ দীপাবলী
মৃদু আলোকিয়া কক্ষ । কুসুম-শয্যায়
আলুলায়িত-কুন্তলা, স্খলিত-বসনা,
নিদ্রা যাইতেছে গোপা, বক্ষে সদ্য শিশু,
সোনার প্রতিমা-বক্ষে সোনার কুসুম—
লইয়া আদরে যেন ;—জিনি' দীপদাম
করিয়াছে আলোকিত গৃহ দুইজন ।
এবার সিদ্ধার্থ-বক্ষ কাঁপিল না আর ;
কেবল দুইটি বিন্দু অশ্রু দু'নয়নে
আসিল, ভাসিল ধীরে মায়ার চরণে
সিদ্ধার্থের সুশীতল শেষ উপহার ! —নবীনচন্দ্র সেন

সিদ্ধার্থ ও বিম্বিসার

সিদ্ধার্থ। করি' পুত্রের কামনা,
কর জগন্মাতা-উপাসনা,
কেন তবে কর বধ কোটী কোটী প্রাণী ?
জগন্মাতা,
পুত্র তাঁর ক্ষুদ্র কীট আদি।
দেখ, নীরব ভাষায়
ছাগপাল মুখ তুলে চায়!
যদি নৃপ, কৃপা নাই কর,
দেবতার কৃপা কেমনে করিবে লাভ ?
নির্দ্দয় যে জন,
দেবগণ নির্দ্দয় তাহার প্রতি।
নরপতি,
কেন প্রাণিনাশ করি' ভাসাইবে ক্ষিতি ?
রাজকার্য্য দুর্ব্বল-পালন,
দুর্ব্বল এ ছাগপাল;
হায়! হায়! ভাষায় বঞ্চিত,
নহে, উচ্চৈঃস্বরে ডাকিত তোমায়—
"প্রাণ যায়, রক্ষা কর নরনাথ!"
মহারাজ,
জীবগণ হিংসি' পরস্পরে,

২

ভাসে মহাদুঃখের সাগরে ;
হিংসায় কভু কি হয় ধর্ম্ম-উপার্জ্জন ?
দেব তুষ্ট হিংসায় কি হয় ?
মহাশয়, জানিহ নিশ্চয়,
হিংসার অধিক পাপ নাহিক জগতে।
প্রাণদানে নাহিক শকতি,
হে ভূপতি,
তবে কেন কর প্রাণনাশ ?
প্রাণের বেদনা বুঝ আপনার প্রাণে।
বাক্যহীন নিরাশ্রয় দেখ ছাগগণে,
কাতর প্রাণের তরে, মানব যেমতি !
মানবের প্রায়,
অস্ত্রাঘাতে ব্যথা লাগে গায়,—
বেদনা জানাতে নারে !
বধি' তারে ধর্ম্ম-উপার্জ্জন,
না হয় কখন—
বিচক্ষণ, বুঝ মনে মনে।
কিন্তু যদি বলিদান বিনা
তুষ্টা নাহি হন ভগবতী—
দেহ মোরে বলিদান।

দ্বাদশ বৎসর করেছি কঠোর তপ,
যদি তাহে হয়ে থাকে ধর্ম্ম-উপার্জ্জন,
করি, রাজা, তোমারে অর্পণ—
সুপুত্র হউক তব।
যদি তব থাকে কোন পাপ,
পুত্র বিনা যার হেতু পেতেছ সন্তাপ,
ইচ্ছায় সে পাপ আমি করিব গ্রহণ।
বধ, রাজা, আমার জীবন,
নিরাশ্রয় ছাগগণে কর প্রাণদান;
নরনাথ, কল্যাণ হইবে,
পুত্র কোলে পাবে,
এড়াইবে জীবহিংসা দায়।
আপন ইচ্ছায়,
তব কার্য্যে অর্পি নিজ কায়,
তাহে তব নাহি পাপ।
রাখ—রাখ যোগীর মিনতি,
বসুমতী কলুষিত ক'র না ভূপাল!
স্বার্থ-হেতু
ক'র না হে কোটী প্রাণী-বধ!
কোথায় ঘাতক,—রাজকার্য্যে বধ মোরে।

বিম্বিসার। মতিমান্,
আমি অতীব অজ্ঞান,
নিজগুণে কর ক্ষমা।
জ্ঞানগর্ভ বাক্যে তব খুলেছে নয়ন,
বুঝিয়াছি হিংসা-সম নাহি পাপ।
তুমি জগদ্‌গুরু—স্থান দেহ শ্রীচরণে।
নাহি আর পুত্রের কামনা,
নাহি রাজ্য-ধন-আশ,—
ত্যজি' বাস যাব সাথে সাথে,
সেবিতে চরণ দু'টি,—
কে তুমি হে, দেহ পরিচয়!
জ্ঞানময়, কভু তুমি নহ সাধারণ,
বঞ্চনা ক'র না, দেব, দেহ পরিচয়।

সিদ্ধার্থ। শুন নরপতি,
হেরি' জীবের দুর্গতি,
আসিয়াছি জ্ঞান-অন্বেষণে।
রাজবংশে একক নন্দন,
ছিল রত্ন-ধন,
আসিয়াছি প্রাণসম প্রেয়সী ত্যজিয়ে।
কর আশীর্ব্বাদ,

যেন পূরে মন-সাধ,
পারি যেন হরিবারে জীবের সন্তাপ।
নরনাথ, বঞ্চহ কল্যাণে,
যাই আমি যথাস্থানে।

বিম্বিসার। প্রভু, আমি যাব তব সাথে—
জীবন ত্যজিব প্রভু, বঞ্চনা করিলে।

সিদ্ধার্থ। হে ভূপাল, ধরহ বচন,
অকারণ রাজ্যধন কি হেতু ত্যজিবে?
প্রেমে কর প্রজার পালন।
হয় যদি সফল জনম,
পাই যদি দুর্লভ রতন,
কহি সত্য বাণী, নৃপমণি,
দিব আনি সে রত্ন তোমারে।
দেখ রাজা, বহিছে সময়,
আর না রহিতে পারি।

বিম্বিসার। মন্ত্রী, রাজ্যে মম সত্বর ঘোষণা দেহ,
জীব-হিংসা কেহ নাহি করে।
ভাণ্ডার হইতে রত্ন কর বিতরণ,—
দেবার্চ্চনা অধিক নাহিক আর।
আছিল যে ভ্রান্ত সংস্কার,
হ'ল দূর সাধু-দরশনে।
আজি হ'তে হবে রাজ্যে বলিহীন পূজা।

—গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বিজয়া দশমী

'যাব না মা যাব না'—
দশ বছরের আহা বালক অতুল,
মায়ের বুকের ধন মমতার ফুল,
কত পুণ্য কত ধর্ম্ম তপস্যার ফল,
বিধাতা দিয়েছে বর ভরিয়ে অঞ্চল !
চিরদুঃখ বৈধব্যের স্বর্গীয় সান্ত্বনা,
সশরীরে দৈববাণী ক্ষুদ্র এক কণা !
বুকেতে রাখিতে গেলে শ্বাসে গ'লে যায়,
পিঠেতে রাখিতে লাগে দূরদেশ তায় !
স্বপনে হারায়ে যায়, জাগ্রতে সংশয়,
আপনারে অবিশ্বাস আপনারে ভয় !
এ হেন প্রাণের ধন—এ হেন অতুল,
সলিলে ভাসায়ে আঁখি নীল সুঁদি ফুল,
'যাবনা' বলিয়ে মা'র ধরিল আঁচল,
সাজিয়া মামারা ডাকে, "চল্ ঢাকা চল্ !
ছুটি ফুরাইয়া গেছে, আজ যাওয়া চাই,
পরীক্ষায় ফেল্ হ'বি করিলে কামাই ।"
শুনিয়া মায়ের হিয়া স্নেহ করুণায়,
গলিয়া নয়নপথে বের হ'তে চায় !
ভাদর—তের শ' সন—চারিদিকে জল,

বিশাল বরুণ-রাজ্য হাসিছে কেবল
বিরাট্‌ তরঙ্গ-ভঙ্গে, শুভ্র ফেনময়
ফুৎকারে উড়িছে থুথু—ভীষণ-বিস্ময় !
নদীনদে শত জিহ্বা করিয়া প্রসার
গ্রাসিয়াছে সারা দেশ চিহ্ন নাহি আর !
অনন্ত অতলস্পর্শ অগাধ গহ্বর
ব্যাদিত কেবল এক মহা দামোদর !

একখানি ছোট নাও বেয়ে যায় ধীরে,
আকুলা জননী দেখে দাঁড়াইয়া তীরে !
স্নেহময় সে চাহনি—সে বন্ধন হায়
দাঁড়ের আঘাতে যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায় !
দুরাশা তথাপি তারে গাঁট দিয়া দিয়া
যত বার ছিঁড়ে যায় জোড়া দেয় গিয়া।
মমতার পুরুভুজ সে কি কভু মরে ?
এক ভুজ কাট যদি শত ভুজ ধরে।

ছৈয়ের ভিতর থেকে বালক অতুল,
কূল পানে চেয়ে চেয়ে নাহি দেখে কূল।
সলিলে হয়েছে অন্ধ নয়নের পথ,
তরাসে হয়েছে অন্ধ দূর ভবিষ্যৎ !

উপরে আকাশ অন্ধ, নীচে অন্ধ জল,
বুকের ভিতর অন্ধ তমস কেবল!
এত অন্ধকারে ভয়ে বাড়াইলা হাত,
যোজন যোজন দূরে দুজনে তফাৎ!
মায়ে পোয়ে হায় সেই শেষের বিদায়,
গোধূলির কোল থেকে রবি অস্ত যায়!
চলে গেল রেলগাড়ী রেখে গেল ধূম,
মলিন করিয়া মার জাগরণ ঘুম!

শরতের শুক্লাষষ্ঠী—যামিনী সুন্দর
লইয়া পাথালি কোলে শিশু শশধর,
ছাড়িয়া সূতিকাগার—তমো সুগভীর,
গগন-অঙ্গনে যেন হয়েছে বাহির!
আনন্দ-সলিলে ভাসে কুমুদ বিমল,
পুলকে পাগল যেন চকোরের দল,
উপবনে হাসে যত কুসুম বালিকা,
সুগন্ধা রজনীগন্ধা স্বর্ণ শেফালিকা!
ব্যাপিয়া বিশাল বঙ্গ কেবল উল্লাস,
জননী স্নেহের আজ বিল্ব অধিবাস!

বাজে শংখ বাজে ঘণ্টা বাজে ঢাক ঢোল,
পাড়া পাড়া বাড়ী বাড়ী মহা গণ্ডগোল;

এসেছে প্রবাসী পিতা পতিপুত্র ভাই,
আনন্দ-সাগরে যেন ভাসিছে সবাই!
নূতন বসন আর নূতন ভূষায়,
সুখের সজীব-বিম্ব শিশু শোভা পায়!
খেলিতেছে নব বেশে বালক-বালিকা,
স্বস্তিক মঙ্গল মুখে পারিজাত লিখা!
ব্যাপিয়া বিশাল বঙ্গ কেবল মিলন,
জননী স্নেহের আজ মহা উদ্বোধন।

অস্ত গেছে দশমীর দীপ্ত শশধর,
আচ্ছাদিয়া অন্ধকারে আকাশ গহ্বর!
তৃতীয় প্রহর গত—নিখিল ভুবন,
একই শয্যায় শুয়ে ঘুমে অচেতন।
তরুলতা ঘুম যায়, ঘুম যায় ফুল,
পল্লবের কোলে কোলে ঘুমায় মুকুল!
আকাশে হেলান দিয়া ঘুমায় পর্ব্বত,
সম্মুখে সমুদ্র পাতা মহা শয্যাবৎ!
দিক্‌বদ্ধ শ্যামমাঠ অনিবদ্ধ নীবি,
স্খলিত অঞ্চল অঙ্গে ঘুমায় পৃথিবী!
অনন্ত শান্তির সুধা ভুগিছে সবাই,
একটি মায়ের চোখে শুধু ঘুম নাই।

চিরদাহ-জাগরণ তার বুকে দিয়া
ঘুম যায় চিতাচুল্লী নিবিয়া নিবিয়া !

দাঁড়ায়ে বাহির বাড়ী অভাগী জননী,
ভাবিতেছে শূন্য পানে চেয়ে একাকিনী,
আসিয়াছে বাড়ী বাড়ী ছেলেপিলে সব,
বিজয়ার বিসর্জ্জন উৎসব নীরব !
কোলে নিয়া জননীরা আপন সন্তান,
কপোলে দিয়েছে চুম্ব শিরে দূর্ব্বাধান !
সকলে পেয়েছে বুকে বুকভরা ধন,
আমার অতুল দেরি করে কি কারণ ?
অরুণের অগ্র-জ্যোতি মৃদু পরকাশ,
প্লাবিয়া রজত স্বর্ণে পূরব আকাশ !
অভাগিণী পাগলিনী আনন্দে ভাসিয়া,
দুই ভুজ মেলে যায় কোলে নিতে গিয়া !
চীৎকারে— অতুল মোর আসিতেছে অই,
খুঁজিতে উড়িল কাক—'ক—ই, ক—ই, ক—ই ?'
মূরছিয়া ধরাতলে পড়িলা জননী,
তুলিতে সহস্র কর মেলে দিনমণি !—
শেফালী ঝরিল আগে, তারকা নিবিল ;
রজনী সজনী তার শোকে প্রাণ দিল !
দেখিল পাড়ার শেষে লোকজন জমি',
জননী-স্নেহের সেই বিজয়া দশমী !

—গোবিন্দচন্দ্র দাস

পুরুরাজ ও আলেকজেণ্ডার

রাজসভা-মাঝে মাসিদন পতি
সমাসীন সিকন্দর।
ঘিরি নর-নাথে বীতিহোত্র-রূপী
শত শত বীরবর !
সহসা অদূরে শৃঙ্খলের ধ্বনি,
অস্ত্র ঝনৎকার সনে
বীর পদক্ষেপে কাঁপাইয়া সভা
চমকিল সর্ব্বজনে !
বন্দী পুরুরাজে ল'য়ে রক্ষীদল
প্রবেশিল সভামাঝে।
ব্যাধগণ মিলি' আনিল বাঁধিয়া
যেন মত্ত মৃগরাজে !
হেরি' সে মূরতি সভা-জন যত
চমকি মুহূর্ত্ত তরে,
আপনা পাসরি' শির নোয়াইয়া
নমিলা সম্ভ্রম ভরে !
মধুর বচনে পুরুরাজে তবে
সম্বোধিয়া সিকান্দর
কহিলেন, "আমি সাহসে তোমার
পরিতুষ্ট বীরবর !

যে বীরত্ব তুমি দেখায়েছ রণে
নাহিক তুলনা তার।
কহ কি বাসনা গুণ-যোগ্য তব
দিব আজি পুরস্কার!"
কহিলা নরেন্দ্র, "ভাগ্যবান্ তুমি,
মহাবীর সিকান্দর!
কিন্তু পুরুরাজ প্রতিদ্বন্দ্বী তব,
ভুলিয়ো না বীরবর!
কৃপার ভিখারী নহি আমি তব,
নাহি চাহি ধন, মান।
জন্ম ক্ষত্রকুলে, সাধি' ক্ষত্রধর্ম্ম
আনন্দে ত্যজিব প্রাণ!"
লজ্জিত বীরেন্দ্র, কহিলা সম্ভ্রমে,
"কহ মোরে, নররাজ!
কি বাসনা তব কোন্ কার্য্য সাধি'
তুষিব তোমারে আজ?"
কহিলা পৌরব, "তুষিতে আমারে
বাসনা যদ্যপি মনে,
প্রচার' আদেশ, লুণ্ঠন হইতে
নিবারহ সেনাগণে!"

"তথাস্তু, নৃমণি," কহিলা বীরেন্দ্র,
"বাসনা হবে পূরণ !
সোনাগণ মম তব রাজ্যে কেহ
না করিবে উৎপীড়ন !
কিন্তু, বীরবর সুধাই তোমারে
বল মোরে একবার ।
মহত্ত্বের তব উপযুক্ত আমি
কি করিব ব্যবহার ?"
নীরবি ক্ষণেক কহিলা রাজেন্দ্র,
"এই মোর নিবেদন ।
রাজা আমি, বীর, কর মোর প্রতি
রাজ-যোগ্য আচরণ !"
শুনি' সিকন্দর সিংহাসন হ'তে
নামিলা সম্ভ্রম-ভরে ;
পুরু-রাজ-পাশে গিয়া, পাশ তাঁর
খুলিলা আপন করে ।
করে কর ধরি' অতি সমাদরে
বসাইলা নিজাসনে ।
সভাজন যত, চিত্রার্পিত প্রায়
নেহারয় দুইজনে !

মুগ্ধ পুরু-রাজ অশ্রুপূর্ণ আঁখি
গদগদ কণ্ঠস্বর !
কহে, "সত্য আজি পরাজিলে মোরে
মাসিদন-অধীশ্বর !"

—শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু

পণ-রক্ষা

“মারাঠা দস্যু আসিছে রে ঐ,
কর কর সবে সাজ !”
আজমীর গড়ে কহিলা হাঁকিয়া
দুর্গেশ দুমরাজ।
বেলা দু-প্রহরে যে-যাহার ঘরে
সেঁকিছে জোয়ারী রুটি,
দুর্গ তোরণে নাকাড়া বাজিতে
বাহিরে আসিল ছুটি’।
প্রাকারে চড়িয়া দেখিল চাহিয়া
দক্ষিণে বহুদূরে—
আকাশ জুড়িয়া উড়িয়াছে ধূলা
মারাঠী অশ্বখুরে।
“মারাঠার যত পতঙ্গপাল
কৃপাণ-অনলে আজ
ঝাঁপ দিয়া পড়ি’ ফিরেনাকো যেন”—
গর্জ্জিলা দুমরাজ।
মাড়োয়ার হ’তে দূত আসি’ বলে—
“বৃথা এ সৈন্যসাজ !
হের এ প্রভুর আদেশ-পত্র,
দুর্গেশ দুমরাজ !

সিন্দে আসিছে, সঙ্গে তাঁহার
ফিরিঙ্গি সেনাপতি,—
সাদরে তাঁদের ছাড়িবে দুর্গ
আজ্ঞা তোমার প্রতি।
বিজয়লক্ষ্মী হয়েছে বিমুখ
বিজয়সিংহ 'পরে,
বিনা সংগ্রামে আজমীর গড়
দিবে মারাঠার করে!"
"প্রভুর আদেশে বীরের ধর্ম্মে
বিরোধ বাধিল আজ"—
নিঃশ্বাস ফেলি' কহিলা কাতরে
দুর্গেশ দুমরাজ!
মাড়োয়ার দূত করিল ঘোষণা—
"ছাড় ছাড় রণ সাজ!"
রহিল পাষাণ মূরতি সমান
দুর্গেশ দুমরাজ!
বেলা যায়-যায়, ধূধূ করে মাঠ,
দূরে দূরে চরে ধেনু,
তরুতল ছায়ে সকরুণ রবে
বাজে রাখালের বেণু।

"আজমীর গড় দিলা যবে মোরে
পণ করিলাম মনে—
প্রভুর দুর্গ শত্রুর করে
ছাড়িব না এ জীবনে !
প্রভুর আদেশে সে সত্য হায়
ভাঙিতে হবে কি আজ ?"-
এতেক ভাবিয়া ফেলে নিঃশ্বাস
দুর্গেশ দুমরাজ।

রাজপুতসেনা সরোষে শরমে
ছাড়িল সমর-সাজ।
নীরবে দাঁড়ায়ে রহিল তোরণে
দুর্গেশ দুমরাজ।
গেরুয়া-বসনা সন্ধ্যা নামিল
পশ্চিম-মাঠ-পারে,
মারাঠী সৈন্য ধূলা উড়াইয়া
থামিল দুর্গদ্বারে।
"দুয়ারের কাছে কে ঐ শয়ান,
ওঠ ওঠ খোল দ্বার !"
নাহি শোনে কেহ, প্রাণহীন দেহ
সাড়া নাহি দিল আর !

প্রভুর কর্ম্মে বীরের ধর্ম্মে
বিরোধ মিটাতে আজ
দুর্গ-দুয়ারে ত্যজিয়াছে প্রাণ
দুর্গেশ দুমরাজ।

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নকল গড়

"জলস্পর্শ কর্‌ব না আর," চিতোর রাণার পণ—
"বুঁদির কেল্লা মাটির 'পরে থাক্‌বে যতক্ষণ।"
"কি প্রতিজ্ঞা, হায় মহারাজ,
মানুষের যা অসাধ্য কাজ
কেমন ক'রে সাধ্‌বে তা আজ?"—কহেন মন্ত্রিগণ।
কহেন রাজা, "সাধ্য না হয় সাধ্‌ব আমার পণ।"

বুঁদির কেল্লা চিতোর হ'তে যোজন তিনেক দূর।
সেথায় হারাবংশী সবাই মহা মহা শূর।
হামু রাজা দিচ্ছে হানা,
ভয় কারে কয় নাইকো জানা,
তাহার সত্য প্রমাণ রাণা পেয়েছেন প্রচুর।
হারাবংশীর কেল্লা বুঁদি যোজন তিনেক দূর।

মন্ত্রী কহে যুক্তি করি—"আজ্‌কে সারারাতি
মাটি দিয়ে বুঁদির মত নকল কেল্লা পাতি।
রাজা এসে আপন করে
দিবেন ভেঙে ধূলির 'পরে,
নইলে শুধু কথার তরে হবেন আত্মঘাতী।"
মন্ত্রী দিল চিতোর-মাঝে নকল কেল্লা পাতি'।

কুম্ভ ছিল রাণার ভৃত্য হারাবংশী বীর,
হরিণ মেরে আস্‌ছে ফিরে স্কন্ধে ধনু-তীর।
খবর পেয়ে কহে—"কে রে
নকল বুঁদি কেল্লা মেরে
হারাবংশী রাজপুতেরে কর্‌বে নতশির ?
নকল বুঁদি রাখ্‌ব আমি হারাবংশী বীর।"

মাটির কেল্লা ভাঙ্‌তে আসেন রাণা মহারাজ।
"দূরে রহ"—কহে কুম্ভ, গর্জ্জে যেন বাজ।
"বুঁদির নামে কর্‌বে খেলা,
সইব না সে অবহেলা,
নকল গড়ের মাটির ঢেলা, রাখ্‌ব আমি আজ।"
কহে কুম্ভ,—"দূরে রহ, রাণা মহারাজ!"

ভূমির 'পরে জানু পাতি' তুলি' ধনুঃশর
একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদিগড়।
রাণার সেনা ঘিরি তারে
মুণ্ড কাটে তরবারে
খেলাগড়ের সিংহদ্বারে, পড়্‌ল ভূমি 'পর
রক্তে তাহার ধন্য হ'ল নকল বুঁদির গড়।

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সামান্য ক্ষতি

বহে মাঘ-মাসে শীতের বাতাস
স্বচ্ছসলিলা বরুণা।
পুরী হ'তে দূরে গ্রামে নির্জ্জনে
শিলাময় ঘাট চম্পকবনে,
স্নানে চলেছেন শত-সখীসনে
কাশীর মহিষী করুণা।

সে পথ সে ঘাট আজি এ প্রভাতে
জনহীন রাজশাসনে।
নিকটে যে ক'টি আছিল কুটীর
ছেড়ে গেছে লোক, তাই নদীতীর
স্তব্ধ গভীর, কেবল পাখীর
কূজন উঠিছে কাননে।

আজি উতরোল উত্তর-বায়ে
উতলা হয়েছে তটিনী।
সোনার আলোক পড়িয়াছে জলে,
পুলকে উছলি' ঢেউ ছলছলে,
লক্ষ মাণিক ঝলকি' আঁচলে
নেচে চলে যেন নটিনী।

কলকল্লোলে লাজ দিল আজ
নারীকণ্ঠের কাকলী !
মৃণাল-ভুজের ললিত বিলাসে
চঞ্চলা নদী মাতে উল্লাসে,
আলাপে-প্রলাপে হাসি-উচ্ছ্বাসে
আকাশ উঠিল আকুলি'।

স্নান সমাপন করিয়া যখন
কূলে উঠে নারী সকলে—
মহিষী কহিলা, "উহু শীতে মরি !
সকল শরীর উঠিছে শিহরি'।
জ্বেলে দে আগুন ওলো সহচরী,
শীত নিবারিব অনলে !"

সখীগণ সবে কুড়াইতে কুটা
চলিল কুসুমকাননে।
কৌতুকরসে পাগল পরাণী
শাখা ধরি' সবে করে টানাটানি ;—
সহসা সবারে ডাক দিয়া রাণী
কহে সহাস্য আননে ;—

"ওলো তোরা আয়!   ওই দেখা যায়
কুটীর কাহার অদূরে!
ওই ঘরে তোরা লাগাবি অনল,
তপ্ত করিব করপদতল!"
এত বলি রাণী রঙ্গে বিভল
হাসিয়া উঠিল মধুরে!

কহিল মালতী সকরুণ অতি,—
"একি পরিহাস রাণী-মা!
আগুন জ্বালায়ে কেন দিবে নাশি'?
এ কুটীর কোন্ সাধু সন্ন্যাসী,
কোন্ দীনজন, কোন্ পরবাসী
বাঁধিয়াছে নাহি জানি মা!"

রাণী কহে রোষে—"দূর করি' দাও
এই দীনদয়াময়ীরে!"—
অতি দুর্দ্দাম কৌতুকরত
যৌবনমদে নিষ্ঠুর যত
যুবতীরা মিলি' পাগলের মত
আগুন লাগাল কুটীরে!

ঘন ঘোর ধূম ঘুরিয়া ঘুরিয়া
ফুলিয়া ফুলিয়া উড়িল।
দেখিতে দেখিতে ধূম্র বিদারি'
ঝলকে ঝলকে উল্কা উগারি'
শত শত লোল জিহ্বা প্রসারি'
বহ্নি আকাশ জুড়িল।

পাতাল ফুঁড়িয়া উঠিল যেন রে
জ্বালাময়ী যত নাগিনী,
ফণা নাচাইয়া অম্বরপানে
মাতিয়া উঠিল গর্জ্জনগানে,—
প্রলয়মত্ত রমণীর কানে
বাজিল দীপক রাগিনী।
প্রভাত-পাখীর আনন্দগান
ভয়ের বিলাপে টুটিল।—

দলে দলে কাক করে কোলাহল,
উত্তর-বায়ু হইল প্রবল,—
কুটীর হইতে কুটীরে অনল
উড়িয়া উড়িয়া ছুটিল।

ছোট গ্রামখানি লেহিয়া লইল
প্রলয়-লোলুপ রসনা।
জনহীন পথে মাঘের প্রভাতে
প্রমোদক্লান্ত শত সখী সাথে
ফিরে গেল রাণী কুবলয় হাতে,
দীপ্ত অরুণ-বসনা।

তখন সভায় বিচার-আসনে
বসিয়া ছিলেন ভূপতি।
গৃহহীন প্রজা দলে দলে আসে,
দ্বিধাকম্পিত গদগদ ভাষে
নিবেদিল দুখ সঙ্কোচে ত্রাসে
চরণে করিয়া বিনতি।

সভাসন ছাড়ি' উঠি' গেল রাজা
রক্তিম-মুখ শরমে।
অকালে পশিলা রাণীর আগার,—
কহিলা,—"মহিষী, একি ব্যবহার?
গৃহ জ্বালাইলে অভাগা প্রজার
বল কোন্ রাজধরমে?"

রুষিয়া কহিলা রাজার মহিলা,—
"গৃহ কহ তারে কি বোধে ?
গেছে গুটিকত জীর্ণ কুটীর,
কতটুকু ক্ষতি হয়েছে প্রাণীর ?
কত ধন যায় রাজমহিষীর
এক প্রহরের প্রমোদে !"

কহিলেন রাজা উদ্যত-রোষে
রুষিয়া দীপ্ত হৃদয়ে,—
"যতদিন তুমি আছ রাজরাণী
দীনের কুটীরে দীনের কি হানি
বুঝিতে নারিবে জানি তাহা জানি—
বুঝাব তোমারে নিদয়ে।"

রাজার আদেশে কিঙ্করী আসি'
ভূষণ ফেলিল খুলিয়া ;
অরুণ-বরণ অম্বরখানি
নির্ম্মম করে খুলে' দিল টানি',
ভিখারী নারীর চীরবাস আনি'
দিল রাণী-দেহে তুলিয়া।

পথে ল'য়ে তারে কহিলেন রাজা—
মাগিবে দুয়ারে দুয়ারে ;
এক প্রহরের লীলায় তোমার
যে ক'টি কুটীর হ'ল ছারখার
যতদিনে পার সে ক'টি আবার
গড়ি' দিতে হবে তোমারে
বৎসর-কাল দিলেম সময়
তার পরে ফিরে আসিয়া,
সভায় দাঁড়ায়ে করিয়া প্রণতি
সবার সমুখে জানাবে যুবতী
হয়েছে জগতে কতটুকু ক্ষতি
"জীর্ণ কুটীর নাশিয়া।"

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বীরপুরুষ

মনে কর যেন বিদেশ ঘুরে
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।
তুমি যাচ্ছ পাল্কীতে মা চড়ে'
দরজা দুটো একটুকু ফাঁক ক'রে,
আমি যাচ্ছি রাঙা ঘোড়ার 'পরে
টগ্‌বগিয়ে তোমার পাশে পাশে।
রাস্তা থেকে ঘোড়ার খুরে খুরে
রাঙা ধুলোয় মেঘ উড়িয়ে আসে।

সন্ধ্যে হ'ল সূর্য্য নামে পাটে,
এলেম যেন জোড়া-দীঘির মাঠে!
ধূধূ করে যে দিক পানে চাই,
কোনোখানে জনমানব নাই,
তুমি যেন আপন মনে তাই
ভয় পেয়েছ, ভাব্‌ছ এলেম কোথা!
আমি বল্‌ছি ভয় কোরো না মাগো
ঐ দেখা যায় মরা নদীর সোঁতা!

চোর কাঁটাতে মাঠ রয়েছে ঢেকে,
মাঝখানেতে পথ গিয়েছে বেঁকে।

গোরু বাছুর নেইক কোনোখানে,
সন্ধ্যে হ'তেই গেছে গাঁয়ের পানে,
আমরা কোথায় যাচ্চি কে তা জানে,
অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো।
তুমি যেন বল্‌লে আমায় ডেকে
"দীঘির ধারে ঐ যে কিসের আলো!"

এমন সময় "হাঁরে রে রে রে রে,"
ঐ যে কা'রা আস্‌তেছে ডাক ছেড়ে!-
তুমি ভয়ে পাল্কীতে এক কোণে
ঠাকুর দেবতা স্মরণ কর্‌চ মনে,
বেয়ারাগুলো পাশের কাঁটা বনে
পাল্কী ছেড়ে কাঁপ্‌ছে থরোথরো!
আমি যেন বল্‌চি তোমায় ডেকে—
'আমি আছি, ভয় কেন মা করো।'

হাতে লাঠি মাথায় ঝাঁকড়া চুল,
কাণে তাদের গোঁজা জবার ফুল।
আমি বলি, "দাঁড়া খবরদার!
এক পা কাছে আসিস্‌ যদি আর

এই চেয়ে দেখ্ আমার তলোয়ার
টুক্‌রো ক'রে দেবো তোদের সেরে !"
শুনে তা'রা লম্ফ দিয়ে উঠে'
চেঁচিয়ে উঠ্‌ল "হাঁরে রে রে রে রে !"
তুমি বল্‌লে, "যাস্‌নে খোকা ওরে,"
আমি বলি, "দেখ না চুপ ক'রে।"
ছুটিয়ে ঘোড়া গেলাম তাদের মাঝে,
ঢাল তলোয়ার ঝন্‌ঝনিয়ে বাজে,
কি ভয়ানক লড়াই হ'ল মা যে,
শুনে তোমার গায়ে দেবে কাঁটা।
কত লোক যে পালিয়ে গেল ভয়ে
কত লোকের মাথা পড়্‌ল কাটা !
এত লোকের সঙ্গে লড়াই ক'রে
ভাব্‌ছ খোকা গেলই বুঝি ম'রে।
আমি তখন রক্ত মেখে ঘেমে
বল্‌চি এসে, "লড়াই গেছে থেমে,"
তুমি শুনে পাল্কী থেকে নেমে
চুমো খেয়ে নিচ্চ আমায় কোলে ;
বল্‌চ, "ভাগ্যে খোকা সঙ্গে ছিল
কি দুর্দ্দশাই হ'ত তা না হ'লে !"

রোজ কত কি ঘটে যাহা তাহা—
এমন কেন সত্যি না হয় আহা!
ঠিক যেন এক গল্প হ'ত তবে,
শুন্‌ত যারা অবাক হ'ত সবে,
দাদা বল্‌ত, "কেমন ক'রে হবে,
খোকার গায়ে এত কি জোর আছে?"
পাড়ার লোকে সবাই বল্‌ত শুনে,
"ভাগ্যে খোকা ছিল মায়ের কাছে!"

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শঙ্খ

তোমার শঙ্খ ধূলায় প'ড়ে, কেমন ক'রে সইবো!
বাতাস আলো গেল ম'রে এ কী রে দুর্দ্দৈব।
লড়্‌বি কি আয় ধ্বজা বেয়ে,
গান আছে যার ওঠ্‌ না গেয়ে,
চল্‌বি যারা চল্‌রে ধেয়ে, আয় না রে নিঃশঙ্ক।
ধূলায় প'ড়ে রইল চেয়ে ঐ যে অভয় শঙ্খ॥

চলেছিলেম পূজার ঘরে সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য।
খুঁজি সারাদিনের পরে কোথায় শান্তি-স্বর্গ।
এবার আমার হৃদয়-ক্ষত
ভেবেছিলেম হবে গত,
ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত হবো নিষ্কলঙ্ক।
পথে দেখি ধূলায় নত তোমার মহাশঙ্খ॥

আরতি-দীপ এই কি জ্বালা, এই কি আমার সন্ধ্যা,
গাঁথ্‌ব রক্ত-জবার মালা, হায় রজনীগন্ধা!
ভেবেছিলেম যোঝাযুঝি
মিটিয়ে পাবো বিরাম খুঁজি,
চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি লব তোমার অঙ্ক।
হেনকালে ডাক্‌লে বুঝি নীরব তব শঙ্খ॥

যৌবনেরি পরশমণি করাও তবে স্পর্শ।
দীপক-তানে উঠুক ধ্বনি' দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।
নিশার বক্ষ বিদার ক'রে
উদ্বোধনে গগন ভ'রে
অন্ধ দিকে দিগন্তরে জাগাও না আতঙ্ক।
দুই হাতে আজ তুল্‌ব ধ'রে তোমার জয়শঙ্খ॥

জানি জানি তন্দ্রা মম রইবে না আর চক্ষে।
জানি শ্রাবণধারা-সম বাণ বাজিবে বক্ষে।
কেউ বা ছুটে আস্‌বে পাশে,
কাঁদ্‌বে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে,
দুঃস্বপনে কাঁপ্‌বে ত্রাসে সুপ্তির পর্য্যঙ্ক!
বাজ্‌বে যে আজ মহোল্লাসে তোমার মহাশঙ্খ॥

তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণ-সজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক্ নব নব,
আঘাত খেয়ে অচল র'ব,
বক্ষে আমার দুঃখে, তোমার বাজ্‌বে জয়ডঙ্ক।
দেবো সকল শক্তি, ল'ব অভয় তব শঙ্খ॥

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পলাতকা

ঐ যেখানে শিরীষ গাছে
ঝুরু ঝুরু কচি পাতার নাচে
ঘাসের 'পরে ছায়াখানি কাঁপায় থরথর
ঝরা ফুলের গন্ধে ভরভর—
ঐখানে মোর পোষা হরিণ চর্‌ত আপন মনে
হেনা-বেড়ার কোণে
শীতের রোদে সারা সকালবেলা।
তারি সঙ্গে কর্‌ত খেলা
পাহাড় থেকে আনা
ঘন রাঙা রোঁয়ায় ঢাকা একটি কুকুরছানা!
যেন তারা দুই বিদেশের দুটি ছেলে
মিলেছে এক পাঠশালেতে, একসাথে তাই বেড়ায় হেসে খেলে।
হাটের দিনে পথের যত লোকে
বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে যেত, দেখ্‌ত অবাক্ চোখে!
ফাগুন মাসে জাগ্‌ল পাগল দখিন হাওয়া
শিউরে ওঠে আকাশ যেন কোন্ প্রেমিকের রঙীন-চিঠি-পাওয়া।
শালের বনে ফুলের মাতন হ'ল সুরু,
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে লাগ্‌ল কাঁপন দুরুদুরু।
হরিণ যে কার উদাস-করা বাণী
হঠাৎ কখন শুন্‌তে পেলে আমরা কি তা জানি!

তাই যে কালো চোখের কোণে
চাউনি তাহার উতল হ'ল অকারণে,
তাই সে থেকে থেকে
হঠাৎ আপন ছায়া দেখে'
চমকে দাঁড়ায় বেঁকে।

একদা এক বিকাল বেলায়
আমলকি-বন অধীর যখন ঝিকিমিকি আলোর খেলায়,
তপ্ত হাওয়া ব্যথিয়ে ওঠে আমের বোলের বাসে,
মাঠের পরে মাঠ হয়ে পার ছুট্‌ল হরিণ নিরুদ্দেশের আশে।
সম্মুখে তার জীবন-মরণ সকল একাকার,
অজানিতের ভয় কিছু নেই আর।

ভেবেছিলেম আঁধার হ'লে পরে
ফির্‌বে ঘরে
চেনা হাতের আদর পাবার তরে!
কুকুরছানা বারে বারে এসে
কাছে ঘেঁসে ঘেঁসে
কেঁদে কেঁদে চোখের চাওয়ায় শুধায় জনে জনে,
"কোথায় গেল, কোথায় গেল, কেন তারে না দেখি অঙ্গনে?"

আহার ত্যজে বেড়ায় সে যে, এলো না তার সাথী।
অাঁধার হ'ল জ্বল্‌ল ঘরে বাতি;
উঠ্‌ল তারা, মাঠে মাঠে নাম্‌ল নীরব রাতি।
আতুর চোখের প্রশ্ন নিয়ে ফেরে কুকুর বাইরে ঘরে,
"নাই সে কেন, যায় কেন সে কাহার তরে?"

কেন যে তা সেই কি জানে? গেছে সে যার ডাকে
কোনো কালে দেখে নাই যে তাকে।
আকাশ হ'তে আলোক হ'তে, নতুন পাতার কাঁচা সবুজ হ'তে
দিশাহারা দখিন হাওয়ার স্রোতে
রক্তে তাহার কেমন এলোমেলো
কিসের খবর এলো
বুকে যে তার বাজ্‌ল বাঁশি বহুযুগের ফাগুন-দিনের সুরে—
কোথায় অনেক দূরে
রয়েছে তার আপন চেয়ে আরো আপন জন।
তারেই অন্বেষণ
জন্ম হ'তে আছে যেন মর্ম্মে তারি লেগে,
আছে যেন ছুটে চলার বেগে,
আছে যেন চল-চপল চোখের কোণে জেগে।
কোনো কালে চেনে নাই সে যারে
সেই তো তাহার চেনাশোনার খেলাধূলা ঘোচায় একেবারে।
অাঁধার তারে ডাক দিয়েচে কেঁদে,
আলোক তারে রাখ্‌ল না আর বেঁধে॥

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী!
তোমার পথের 'পরে তপ্ত রৌদ্র এনেছে আহ্বান
রুদ্রের ভৈরব গান।
দূর হ'তে দূরে
বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান স্বরে,
যেন পথহারা
কোন্ বৈরাগীর একতারা।

ওরে যাত্রী,
ধূসর পথের ধূলা সেই তোর ধাত্রী,
চলার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণাপাকে বক্ষেতে আবরি'
ধরার বন্ধন হ'তে নিয়ে যাক্ হরি'
দিগন্তের পারে দিগন্তরে।

পথে পথে অপেক্ষিছে কাল-বৈশাখীর আশীর্ব্বাদ,
শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা।
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।

ক্ষতি এনে দিবে পদে অমূল্য অদৃশ্য উপহার।
চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার,—
সে ত নহে সুখ, ওরে, সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।
মৃত্যু তোরে দিবে হানা,
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা,
এই তোর নব বৎসরের আশীর্ব্বাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।
ভয় নাই, ভয় নাই, যাত্রী,
ঘরছাড়া দিক্‌হারা অলক্ষ্মী তোমার বরদাত্রী।

পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল ওরে যাত্রী!
এসেছে নিষ্ঠুর,
হোক্‌রে দ্বারের বন্ধ দূর,
হোক্‌রে মদের পাত্র চূর!
নাই বুঝি, নাই চিনি, নাই তারে জানি,
ধর তার পাণি,—
ধ্বনিয়া উঠুক তব হৃৎকম্পনে তা'র দীপ্ত বাণী।
ওরে যাত্রী
গেছে কেটে, যাক্ কেটে পুরাতন রাত্রি!

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লক্ষ্য পথে

দৈন্য যদি আসে, আসুক, লজ্জা কিবা তাহে ?
মাথা উঁচু রাখিস্।
সুখের সাথী মুখের পানে যদি নাহি চাহে,
ধৈর্য্য ধ'রে থাকিস্।
রুদ্ররূপে তীব্র দুঃখ যদি আসে নেমে,
বুক ফুলিয়ে দাঁড়াস্।
আকাশ যদি বজ্র নিয়ে মাথায় পড়ে ভেঙে,
ঊর্দ্ধে দু'হাত বাড়াস্।
চোখের-জলে-ভিজে আওয়াজ কেউ যেন না শোনে,
মাকে যখন ডাকিস্।
তাঁরই দেওয়া অন্ধকারের গাঢ়তম কোণে,
মুখখানি তোর ঢাকিস্।
আধি-ব্যাধির ধান-দূর্ব্বা পূর্ণ আশীর্ব্বাদে,
মাথায় ঝ'রে পড়ুক।
বাসা-ভাঙা সুখের আশা জীর্ণ জরার সাথে,
স্তব্ধ হ'য়ে মরুক।
কোথায় তুমি তথাগত ব্যাধি-জরা-জয়ী ?
দাঁড়াও এসে কাছে !
নিত্য উৎসরিত তোমার আলোর ঝরা কই
অন্ধকূপের মাঝে ?

ভগ্ন স্তূপের জীর্ণ মঞ্চের সুপ্ত ছায়া জুড়ে'

মৃত্যু বাসা বাঁধে।

অমানিশার রুদ্ধকারায় ক্ষুব্ধ বায়ু ঘুরে'

নিঃশ্বসিয়ে কাঁদে।

বিশ্বপটের চারুদৃশ্য মুছে গেল ব'লে

বুক যেন না দমে।

নির্ভয়ে তুই রাখ্‌ রে মাথা কালরাত্রির কোলে,

করবে কিবা যমে ?

থাক্‌বে দুঃখ, দৈন্য, জরা শুকিয়ে ঘাটের পাড়ে,

তুচ্ছ করিস্‌ তাকে।

ঐ শোন্‌রে বাজিয়ে বাঁশী নদীর পর পারে,

কে যেন রে ডাকে !

সুর বেঁধে নে ওরে আতুর, পরপারের গাথার

মধু-ঝরা সুরে।

ক্লান্তি-ভরা শান্তি-হরা গুরু বোঝা মাথার

ফেলে দিয়ে দূরে,

গাওরে প্রীতির নবগীতি। মৃত্যু মরুক কেঁদে,—

কেউ পাবে না সাড়া।

যাক্‌ না ডুবে রূপের জগৎ! নূতন বিশ্ব বেঁধে

সোজা হ'য়ে দাঁড়া। —শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার
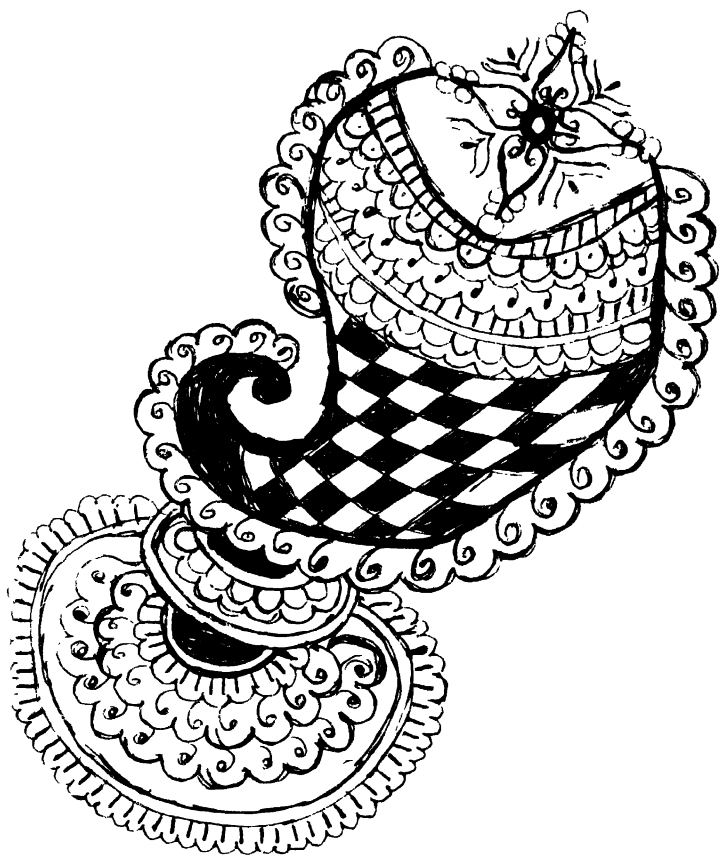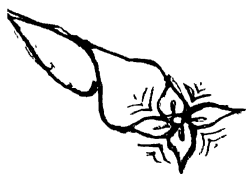
নন্দলাল

নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ-পণ—
স্বদেশের তরে, যা' ক'রেই হোক্, রাখিবেই সে-জীবন।
সকলে বলিল "আ-হা-হা কর কি, কর কি, নন্দলাল ?"
নন্দ বলিল, "বসিয়া বসিয়া রহিব কি চিরকাল ?
আমি না করিলে, কে করিবে আর উদ্ধার এই দেশ ?"
তখন সকলে বলিল—বাহবা বাহবা বাহবা বেশ !
নন্দর ভাই কলেরায় মরে, দেখিবে তাহারে কেবা ?
সকলে বলিল, "যাওনা নন্দ, করনা ভা'য়ের সেবা।"
নন্দ বলিল, "ভায়ের জন্য জীবনটা যদি দিই—
না হয় দিলাম—কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কি ?
বাঁচাটা আমার অতি দরকার, ভেবে দেখি চারিদিক।"
তখন সকলে বলিল—হাঁ হাঁ হাঁ—তা বটে, তা বটে, ঠিক !
নন্দ একদা হঠাৎ একটা কাগজ করিল বাহির ;
গালি দিয়া সবে গদ্যে পদ্যে বিদ্যা করিল জাহির ;
পড়িল ধন্য দেশের জন্য নন্দ খাটিয়া খুন ;
লেখে যত তার দ্বিগুণ ঘুমায়, খায় তার দশগুণ।—
খাইতে ধরিল লুচি ও ছোকা ও সন্দেশ থাল থাল ;
তখন সকলে বলিল—বাহবা বাহবা নন্দলাল !
নন্দ একদা কাগজেতে এক সাহেবকে দেয় গালি ;
সাহেব আসিয়া গলাটি তাহার টিপিয়া ধরিল খালি।

নন্দ বলিল, "আ-হা-হা! কর কি, কর কি, ছাড় না ছাই,
কি হবে দেশের, গলা-টিপুনিতে আমি যদি মারা যাই!
বল ক' বিঘৎ নাকে দিব খত, যা বল করিব তাহা' !"
তখন সকলে বলিল—বাহবা বাহবা বাহবা বাহা?
নন্দ বাড়ীর হ'ত না বাহির, কোথা কি ঘটে কি জানি!
চড়িত না গাড়ী, কি জানি কখন উল্‌টায় গাড়ী খানি;
নৌকা ফি-সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে 'কলিশন' হয়;
হাঁটিতে সর্প কুক্কুর আর গাড়ী-চাপা পড়া ভয়!
তাই শুয়ে শুয়ে, কষ্টে বাঁচিয়ে রহিল নন্দলাল।
সকলে বলিল—ভ্যালারে নন্দ, বেঁচে থাক্ চিরকাল!

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বঙ্গভূমি

প্রণমি তোমারে আমি, সাগর-উত্থিতে,
ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী, অয়ি জননী আমার !
তোমার শ্রীপদ-রজঃ এখনো লভিতে
প্রসারিছে করপুট ক্ষুব্ধ পারাবার।
শত-শৃঙ্গ বাহু তুলি' হিমাদ্রি-শিয়রে
করিছেন আশীর্ব্বাদ-স্থির-নেত্রে চাহি' ;
শুভ্র মেঘ-জটাজালে দুলে বায়ুভরে,
স্নেহ অশ্রু শতধারে ঝরে বক্ষঃ বাহি'।
জ্বলিছে কিরীট তব নিদাঘ-তপন,
ছুটিতেছে দিকে দিকে দীপ্ত রশ্মি-শিখা ;
জ্বলিয়া—জ্বলিয়া উঠে শুষ্ক কাশবন,
নদীতট-বালুকায় সুবর্ণ-কণিকা !
গভীর সুন্দর-বনে তুমি শ্যামাঙ্গিনী
বসি' স্নিগ্ধ বটমূলে—নেত্র নিদ্রাকুল !
শিরে ধরে ফণাচ্ছত্র কাল-ভুজঙ্গিনী,
অবলেহে পা দু'খানি আগ্রহে শার্দ্দূল
নব-বরষার চূর্ণ-জলদ-কুন্তল
উড়িয়ে-ছড়িয়ে পড়ে শ্রীমুখ আবরি' !
চাতকী ডাকিছে দূরে, শিখিনী চঞ্চল,
মেঘমন্দ্রে কৃষকের চিত্ত যায় ভরি'।

বিস্তীর্ণ পদ্মার তুমি ভগ্ন উপকূলে
　　ব'সে আছ মেঘস্তূপে অসিত-বরণা।
নক্র-কুল নত-তুণ্ড পড়ি' পদমূলে,
　　তুলি' শুভ করিযূথ করিছে বন্দনা।
সরে মেঘ ফুটে ধীরে বসন-চন্দ্রমা ?
　　বিভোর চকোর উড়ে নয়ন-সোহাগে ;
লুটে ভূমে শ্রী-অঙ্গের শ্যামল-সুষমা,
　　চরণ-অলক্তরাগ তড়াগে তড়াগে।
মূর্ত্তিমতী হ'য়ে, সতী, এস ঘরে ঘরে,
　　রাখ' ক্ষুদ্র কপর্দ্দকে রাঙ্গা-পা-দু'খানি !
ধান্য-শীর্ষ স্বর্ণ-ঝাঁপি লও রাঙ্গা করে—
　　ভুলে' যাই—সর্ব্ব দৈন্য, সর্ব্ব দুঃখ গ্লানি।

—অক্ষয়কুমার বড়াল

———

বেলা যায়

একদা কোনও এক রজকের ঘরে
ডাকিছে বালিকা অতি সোহাগের স্বরে,
নিদ্রিত পিতারে,—'ওঠ বাবা, বেলা যায়!'
তখন গ্রামের সূর্য্য অস্তে যায় যায়।
বালিকার কম্প্রকণ্ঠ চঞ্চল পবনে
সঞ্চারিল স্তব্ধতায়। শিবিকারোহণে
অদূরে গৃহের পথে ফিরিছেন যথা
লালাবাবু কর্ম্মস্থল হ'তে, দুটি কথা
চ'লে গেল সেথা! নিস্তব্ধ শিবিকা হ'তে
'থামাও থামাও,'—প্রৌঢ় বলে মধ্যপথে,—
'ওরে বেলা যায়!' বিস্মিত বাহকগণ
রাখিল শিবিকা। লালা কম্পিতচরণ,
দাঁড়াইয়া জীবনের প্রশান্ত সন্ধ্যায়
আপনারে উঠিলা ডাকিয়া,—'বেলা যায়!'
বহুমূল্য বেশ-বাস ফেলিলেন খুলে,
ভৃত্যগণে দিলেন বিদায়! বক্ষে তুলে'
লইলেন জীবনের কুজ্ঝটিকা হ'তে
প্রজ্ঞার আলোক!
অ-দোসর, বিশ্বস্রোতে
ঝাঁপায়ে পড়িল বেগে। জ্বলে হুতাশন

ছলছল নেত্রপ্রান্তে ; কি জানি দাহন
অনুতপ্ত উচ্চ হৃদয়ের ! ঊর্দ্ধে চাহি'
নিঃশ্বসিলা ! কোথা হ'তে উঠিলা কে গাহি'
সেই ছুটি কথা, 'বেলা যায় !'—'বেলা যায় !'
বিশাল অনন্ত প্লাবি' গম্ভীর সন্ধ্যায়।
সাবধানী তিরস্কার, মঙ্গল-শাসন,
স্নেহ-রোষে ইঙ্গিতে কি জানা'ল গগন ?

হুহু করি' সান্ধ্য বায়ু ফেলিয়া নিঃশ্বাস,
নেমে এল শূন্য হ'তে ; ত্যজি দিবাবাস
মহাবেগে ব্যোমচর ধাইছে অম্বরে ;
অকিঞ্চন রশ্মিলেশ কম্পিত অন্তরে
যাইতেছে হারাইয়া !

কোথা গেল রবি
দিগন্তের প্রান্তে নেমে ? মুছে' গেছে ছবি
দৃপ্ত দিবসের ! ফিরে আসে গাভীগুলি
অর্দ্ধভুক্ত তৃণ ফেলি' ; হেরিয়া গোধূলি
কর্ম্মব্যস্ত কৃষাণেরা লইল বিদায়
ধান্যপূর্ণ ক্ষেত্র পাশে রুদ্ধ বেদনায় !
হেরিলা অধীরে প্রৌঢ়, চারি-দিক-ভরা
কেবল বিদায়-যাত্রা ; মুক্ত, মায়াহরা

ত্যাগের ঘোষণা !

ছুটিলা তৃষিত মনে,

কার ছদ্ম করুণার শুভ আকর্ষণে !

লক্ষকোটি নভ-আঁখি সাক্ষী হ'ল তার,

নীরবে দেখা'ল পথ নাশি' অন্ধকার !

পুরাতন, পরিচিত, বহু-উচ্চারিত

'বেলা যায়'—এই দুটি কথা, রোমাঞ্চিত

অন্তরের অন্তঃকর্ণে লাগিলা শুনিতে ;

সম্মোহন কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত নিশিতে !

—প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

কেদার রায়ের যুদ্ধ আয়োজন

কালীগঙ্গার তীরে—
রাজধানী শ্রীপুরে,
অসি ক্ষুরধার
জ্বলিল আবার
বঙ্গবীরের করে।
কালীগঙ্গার তীরে!

আনিয়া মোগল সেনা
রাজা মান দেয় হানা,—
করিবারে চায়
বঙ্গ-বিজয়
আয়োজন করে নানা—
বিপুল মোগল সেনা!

কহিলা বঙ্গবীরে
ডাকিয়া কেদার রায়,—
'অরাতি আসিল দ্বারে
অতিথির মান চায়।
দুইবার ঘোর রণে—
জিনিয়াছ রাজা মানে,—

বাঙ্গালী বিমুখ হবে কি এবার
অতিথি যাবে কি ফিরে !'
কহিলা বঙ্গবীরে।

ঝলসি' উঠিল শত তরবার
গরজে বঙ্গবীর।
কাঁপিল গঙ্গাতীর।
বলে সবে, 'চল চল এইবার
মোগলের সাধ মিটাব আবার
দিব না যাইতে ফিরে।
দিল্লীর রাজপুরে।'

কালীগঙ্গার তীরে—
মা আজি জাগিল কি রে ?
বঙ্গমাতার আশিষ নামিল
ভক্তের শিরোপরে,
কালীগঙ্গার তীরে !

বীরের শিরায় রক্ত বহিল
তপ্ত অনল হেন—
বিক্রম আজি বিক্রমপুরে
মূর্ত্তি লইল যেন।

সমর-তরীতে মোগল কাঁপিল
গর্জ্জন শুনি' ভয়ে।
ভক্তের শির লুণ্ঠিত হলো
বঙ্গমাতার পায়ে।

—শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

সিংহ গড়

উমরাটিপুরে সুবেদার-গৃহে সেদিন বাজিছে বাঁশী,
—তানাজী পুত্র রায়বার বিয়ে ; প্রমত্ত পুরবাসী ;
নানা আয়োজন, ভারি ধূমধাম ;
নৃত্য ও গীত চলে অবিরাম ;
দাঁড়াইল বর—বাজিল শঙ্খ, জ্বলিল আলোকরাশি—
এ হেন সময় শিবাজীর দূত সভায় দাঁড়া'ল আসি'।

পাঠ করি' লিপি বজ্র-কণ্ঠে হাঁকিলা মালেশ্বর,—
'নামাও বংশী, থামাও নৃত্য, সাজ খুলে' ফেল বর !
কঠিন বিবাহ ঘনায়েছে আজ—
তারই লাগি' সবে পর নব সাজ,
সেই মিলনের শুভ-লগ্নের সময় অগ্রসর—
রে বরযাত্রী ! আগত রাত্রি—হও সবে সত্বর !'

লিপির বারতা শুনিলা সকলে সাগ্রহে পাতি' কাণ,
হাজার কণ্ঠে ধ্বনিল অমনি শিবাজীর আহ্বান !
অন্তঃপুরে পুরনারী যত
শুনিলা সে বাণী স্বপ্নের মত,
বিস্ময়-হত হিয়া শত শত, তবু নহে ম্রিয়মাণ,
নব-উৎসাহে উঠিল জ্বলিয়া পদাহত সম্মান।

বারো সহস্র মাওয়ালি সৈন্য সাজিলা বারতা পেয়ে,
তাই লয়ে সাথে প্রচণ্ড তেজে চলিলা তানাজী ধেয়ে ;
রায়গড়ে আসি' রাজারে শুধায়,—
'কি আদেশ প্রভু, ঘটিল কি দায় ?'
উত্তর শুধু করিলা শিবাজী—জননীর পানে চেয়ে,
'বন্ধু, তোমায় আমি ডাকি নাই,—ভবানী মায়ের মেয়ে।'

জননী অমনি তানাজীর মুখে ঘুরায়ে প্রদীপখানি,
অঙ্গুলি ভাঙি' ললাট পরশি' বালাই লইয়া টানি',
কহিলা মধুর-গম্ভীর রবে,
'সিংগড় মোরে জিনে' দিতে হবে,
বৎস আমার ! আজ হ'তে তোরে দ্বিতীয় পুত্র মানি।'—
তানাজীর মুখে অপূর্ব্ব সুখে বন্ধ হইল বাণী !

হাঁকি' পুনরায় কহে জীজাবাঈ,—'ছি ! ছি !' তোরা কাপুরুষ !
বীরের কর্ম্ম আপন ধর্ম্মে করে সে নিষ্কলুষ।
বেদ-ব্রাহ্মণ নিষ্ঠা-আচার,
ধর্ম্ম-যজ্ঞ বিবেক-বিচার—
চরণে দলিত হেরি' বারবার, তথাপি হয় না হুঁস্—
ধিক্কারে ভরা লাঞ্ছনা তোরা মর্ম্মে লুকায়ে থু'স্ !

'দেখিস্ না চেয়ে—চোখের উপরে কিবা হয় দিবারাত,
পাপ—সে হাসিয়া পুণ্যের শিরে করিতেছে পদাঘাত ;
দরিদ্র দীন মূক অসহায়
ধনীর দুয়ারে আপনা বিকায়,
দম্ভী দর্পী হেলায় ঘৃণায় হেসে করে দৃক্‌পাত—
গড় নয়, আজ যা কিছু তোদের গেল সে পরের হাত !

'তবু বেঁচে থাকা—তবু প্রাণ রাখা, পদে পদে সহি' গ্লানি,
মারাঠার বুকে হেরি' হাসিমুখে মোগলের রাজধানী !
সাজি' তারই দাস, তাহারই নফর,
বিলাইয়া দিলি আপনার ঘর,
মসী অঙ্কিত ললাটের 'পর তিলক-পঙ্ক টানি'—
মহারাষ্ট্রের হেন কলঙ্ক—সহিবে কি মা ভবানী ?

'তাই থাক্ তোরা, লজ্জা লুকায়ে অন্ধ বিবরমাঝে,
থাক্ বারো-মাস মোগলের দাস ঘৃণ্য অধম কাজে ;
আমি যাই—মোর ফুরায়েছে কাল,
মিছে বেঁচে থাকা হ'য়ে জঞ্জাল,
আপনার মান পরেরে বিকায়ে লাঞ্ছনা ভরা লাজে—
সিংহগড়ের দুর্গে আজিকে মোগল-ডঙ্কা বাজে !'

রুদ্ধকণ্ঠে কহিলা তানাজী, 'তাই হবে, তাই হবে,
ফিরায়ে আনিব সিংহগড়ের নির্জ্জিত গৌরবে ;
শপথ করিনু অসি ছুঁয়ে আজ,
ঘুচাব রাষ্ট্র-কলঙ্ক-লাজ,
অথবা পরাণ সঁপি' দিব আজ মরণ-মহোৎসবে—
ক্ষয়-ক্ষতি-লাজ ডুবাইব আজ বিজয়ের তাণ্ডবে।'

পরশিয়া পুনঃ মায়ের চরণ চলি' গেলা বীর ধীরে,
বারো সহস্র মাওয়ালি সৈন্য চলিলা সঙ্গে ঘিরে'।
সিংহগড়ের দুর্গ চূড়ায়,
সূর্য্য তখন স্বর্ণ কুড়ায়,
সন্ধ্যা তাহার রক্ত ছড়ায় 'ডঙ্গী' শৈলশিরে ;
দূরে সেনা রাখি' চলিলা তানাজী পাহাড়ের কোল ভিড়ে'।

তারপর যাহা- ইতিহাস তাহা শোনে নাই কোনও কালে ;
সত্য যাহার স্বপ্নের মত'—দীপ্ত ইন্দ্রজালে।
থার্ম্মপলির পুণ্য-কাহিনী,
হল্‌দীঘাটের ধন্য বাহিনী—
অপূর্ব্ব কথা—তুলনা পাইনি তবু এর কোনও কালে,
ভাগ্য যে লিপি লিখিলা সে দিন মহারাষ্ট্রের ভালে!

* * * *

সপ্তাহ পরে এল রায়গড়ে সিংহগড়ের চর ;
শুনিলা সকলে সভয়ে গর্ব্বে জয় সে ভয়ঙ্কর।
জীজাবায়ে শুধু কহিলা শিবাজী,—
'সিংগড়, মাতা, ফিরে' লও আজি,
সিংহগড়ের সিংহ গিয়াছে—পড়ে' আছে শুধু গড়—
তাই লও মাতা, হারায়ে পুত্র—তানাজী মালেশ্বর।'

—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

মুক্ত হাওয়া মুক্ত আলোর যুক্ত-বেণী সঙ্গমে
রঙীন হ'য়ে উঠ্‌ছি মোরা সবুজ শোভা বিভ্রমে।
সত্যিকালের বৃক্ষ ওগো! বনের বনস্পতি গো!
আমরা তোমার প্রাণের আলো স্নেহ-সরস জ্যোতি গো।

সুখ নাহিক স্বস্তি নাহি আনন্দ নাই আওতাতে,
সোনার রোদে সবুজ মোরা আলোক-মদের মৌতাতে।
মেতেছে মন প্রাণ মেতেছে, না জানি কোন্ সন্ধানে,
পল্লবিত বনের হিয়া যৌবনেরি জয়-গানে।

রবির আলোর গোপন কথা—আমরা চির-তারুণ্য!
গুপ্ত আশার ব্যক্ত নিশান; কঠিন কঠোর কারুণ্য।
স্তর পড়েছে পঞ্জরে যার, থর পড়েছে বল্কলে
মোদের তরে পথ সে করে কোন্ রভসের কোন্ ছলে!

আদিম রসের আমরা রসিক আমরা নব-ঘন-শ্যাম,
ফাগুন হাওয়ার দাদ্‌রা তালে নৃত্য মোদের অবিশ্রাম,
হিমের রাতে আমরা জাগি, আমরা কভু ঝিমাই নে,
সবুজ দীপের দীপান্বিতা এক্কেবারে নিবাই নে।

আমরা সবুজ অসঙ্কোচে, আমরা তাজা,—গৌরবে,
আমোদ করি সবুজ মোহে উশীর-ঘন-সৌরভে,

আমরা কাঁচা আমরা সাঁচা মরা-বাঁচার নাই খেয়াল,
আমরা তরুণ ভয় করিনে ঝোড়ো হাওয়ার রুদ্র তাল।

বুক পেতে নিই হাস্যমুখে রৌদ্রখর বৈশাখী,
স্নিগ্ধ মধুর শ্যামল সরস মদির ছায়ার হই সাকী,
ভাঙ্গা মেঘ আর ঝরা পাতায় সাজায় রবি গৈরীকে
আমরা তপে পেলাম সবুজ—গৈরিকেরি বৈরীকে।

মুক্ত হাওয়া দীপ্ত আলো চায় গো কাণে মন্ত্রণা,
শুন্‌ছ কথা ?—বল্‌ছে "জগৎ মোক্ষলাভের যন্ত্র না।
নয় সে শুধুই তত্ত্বকথা, নয় সে মাত্র মত্ততা,
তরুণ যাহা তাহাই তথ্য,—বল্‌ছে সবুজ পত্র তা।"

আমরা সবুজ, আমরা সবুজ—আলো-ছায়ার আলিঙ্গন,
ক্লান্ত আঁখির সঞ্জীবনী, নিরঞ্জনের প্রেমাঞ্জন।
রসের রঙের ধাত্রী ধরা! গানের প্রাণের মাতৃকা!
এই সবুজের ছত্রতলে যৌবনে দাও রাজটীকা।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

আমরা

মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই তীর্থে—বরদ বঙ্গে,—
বাম হাতে যার কমলার ফুল, ডাহিনে মধুক-মালা,
ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ-মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,
কোল-ভরা যার কনক ধান্য, বুকভরা যার স্নেহ,
চরণে পদ্ম, অতসী অপরাজিতায় ভূষিত দেহ,
সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গ ভঙ্গে,—
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত-ভূমি বঙ্গে।

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি,
আমরা হেলায় নাগেরে খেলাই, নাগেরি মাথায় নাচি।
আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে,
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।
আমাদের ছেলে বিজয়সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্য্যের পরিচয়।
এক হাতে মোরা মগেরে রুখেছি মোগলেরে আর হাতে,
চাঁদ-প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।

জ্ঞানের নিধান আদি বিদ্বান্ কপিল সাঙ্খ্যকার
এই বাঙ্লার মাটিতে গাঁথিল সূত্রে হীরক-হার।

বাঙ্গালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙ্গালী দীপঙ্কর।
কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষশাতন করি'
বাঙ্গালীর ছেলে ফিরে এলো দেশে যশের মুকুট পরি'।
বাঙ্‌লার রবি জয়দেব কবি কান্ত-কোমল পদে
করেছে সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন-কোকনদে।

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে 'বরভূধরে'র ভিত্তি,
শ্যাম কম্বোজে 'ওঙ্কার-ধাম',—মোদেরি প্রাচীন কীর্ত্তি।
ধেয়ানের ধ্যানে মূর্ত্তি দিয়েছে আমাদের ভাস্কর
বিট্‌পাল আর ধীমান্, যাদের নাম অবিনশ্বর।
আমাদেরি কোনো সুপটু পটুয়া লীলায়িত তুলিকায়
আমাদের পট অক্ষয় ক'রে রেখেছে অজন্তায়।
কীর্ত্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি'
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।

মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি,
বাঁচিয়া গিয়াছি বিধির আশিষে অমৃতের টীকা পরি'।
দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি, আকাশে প্রদীপ জ্বালি,
আমাদেরি এই কুটীরে দেখেছি মানুষের ঠাকুরালি।

ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
বাঙ্গালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।
বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়,—
বাঙ্গালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।
তপের প্রভাবে বাঙ্গালী সাধক জড়ের পেয়েছে সাড়া,
আমাদের এই নবীন সাধনা শব-সাধনার বাড়া।
বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে বাঙ্গালী দিয়াছে বিয়া,
মোদের নব্য রসায়ন শুধু গরমিলে মিলাইয়া।
বাঙ্গালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান,
বিফল নহে এ বাঙ্গালী জনম বিফল নহে এ প্রাণ।
ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশা-ভরা আহ্লাদে,
বিধাতার কাজ সাধিবে বাঙ্গালী ধাতার আশীর্ব্বাদে।
মণি অতুলন ছিল যে গোপন সৃজনের শতদলে,—
ভবিষ্যতের অমর সে বীজ আমাদেরি করতলে,
অতীতে যাহার হয়েছে সূচনা সে ঘটনা হবে হবে,
বিধাতার বরে ভরিবে ভুবন বাঙ্গালীর গৌরবে।
প্রতিভায় তপে সে ঘটনা হবে লাগিবে না তার বেশি,
লাগিবে না তাহে বাহুবল কিবা জাগিবে না দ্বেষাদ্বেষী ;
মিলনের মহামন্ত্রে মানবে দীক্ষিত করি' ধীরে—
মুক্ত হইব দেবঋণে মোরা মুক্তবেণীর তীরে।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ইন্‌সাফ

ডঙ্কা নিশান সঙ্গে লইয়া লস্কর অফুরান্‌
রাজ্য-পরিক্রমায় চলেন সুলতান বুল্‌বান্‌।
স্নিগ্ধ নয়নে প্রসাদ-সত্র, প্রতাপ-ছত্র মাথে
চলেছেন রাজা, দিল্লী-নগরী চলে যেন তাঁর সাথে।
সাথে সাথে চলে উর্দ্দু-বাজার, হাজার হাজার হাতী,
চলেছে জোয়ান পাঠ্‌ঠা পাঠান হাতে নিয়ে ঢাল-কাতী।
বল্লম-ধারী চলে সারি সারি,—ফলায় আলোক জ্বলে,
প্রজার নালিশ শুনিয়া ফেরেন মালিক সদল-বলে।
কত সাজা কত শিরোপা বিতরি' নগরে নগরে, শেষে
হাওদা নড়িল, ছাউনি পড়িল বদাউন্‌-পুরে এসে।
দিল্লীপতির প্রিয়পাত্র সে বদাউন-সর্দ্দার,
নগরী সাজিল নাগরীর মত ইশারায় যেন তার।
কোথাও দুঃখ নাই যেন, কোনো নাইকো নালিশ কারু,
দুনিয়া কেবল ঢালা-মখ্‌মল্‌ চুমকীর কাজে চারু।
ভোজে আর নাচে কুচে ও কাওয়াজে কাটে দিন মৃগয়ায়;
লোক খাসা অতি বদাউন-পতি সন্দেহ নাহি তায়।
বিশ্রামে বিশ্রম্ভ-আলাপে কাটে দিন কোথা দিয়ে,
রাজ-অতিথির বিদায়ের দিন ক্রমে আসে ঘনাইয়ে।
বদাউন্‌-বনে সে বারের মত শীকার করিয়া সারা
দঙ্গল ফেরে সুল্‌তান্‌ সহ উল্লাসে মতোয়ারা।

সঙ্গে চলেন বদাউন্-পতি করিয়া তূর্য্যনাদ।
সহসা কে নারী উঠিল ফুকারি'—"সুল্তান্! ফরিয়াদ।"

চমকি' চাহিয়া বদাউন্-পতি বক্‌বক্ মিয়া কন্—
"দেওয়ানা! দেওয়ানা! হঠাও উহারে, কি ছাখো সিপাহিগণ!"

সুল্তান্ কন্, "না না, আনো কাছে, কি আছে নালিশ, শুনি।"
প্রমাদ গণিয়া আড়ে চায় যত ওম্‌রাহ বদাউনী।
শাহান্‌শাহের হুকুমে সিপাহী কাছে গেল জেনানার,
আঁখি বিস্ফারি' কাছে এল নারী বাদশাহী হাওদার।
"কিবা ফরিয়াদ? কহ ফরিয়াদি, নালিশ কাহার 'পরে?"
"ভয়ে কব? কিবা নির্ভয়ে, প্রভু!" পুছে সে যুক্ত-করে।
"নির্ভয়ে কহ" বলেন হাকিম। নারী কয় ঋজু-কায়া—
"হত্যাকারীর সাজা দাও প্রভু! জগৎপ্রভুর ছায়া!
স্বামীরে আমার হত্যা করেছে বদাউন-সর্দ্দার,
এই মাতালের কোড়ার প্রহারে জীবন গিয়াছে তার।"

"কে তোর সাক্ষী, মিথ্যাবাদিনী, কে তোর সাক্ষী শুনি?"
"ধর্ম্মের প্রতিনিধি এসেছেন, বুঝে কথা কও, খুনী!
সাক্ষী খুঁজিছ? সাক্ষী আমার সারা বদাউন্‌ভূমি,
সাক্ষী আমার ঐ কালা-মুখ, আমার সাক্ষী তুমি!

সাক্ষী তোমারি ভৃত্য, যাহারে গিলেছে পাষাণ-কারা ;
আমার সাক্ষী রাজপুরুষেরা নালিশ নিলে না যারা।”
বজ্রদীপ্তি যুগল চক্ষে সুল্‌তান্ বুল্‌বান্
চর-পরিষদ-পতিরে করেন সঙ্কেতে আহ্বান।
নিভৃতে তাহারে কি কহিল নৃপ, নিমিষে ছুটিল চর,
নিমেষে আসিল কয়েদখানার সাক্ষীরা তৎপর।
আসিল কোরান, সাক্ষী-জবানবন্দী হইল পাকা,
সাক্ষ্য-প্রমাণ বাক্য নারীর,—নয় মিছে, নয় ফাঁকা।
বচন-দক্ষ মিথ্যাপক্ষ—হেরে গিয়ে হ'ল রূঢ়,
বর্ব্বরতায় গর্ব্বের বেশে জাহির করিল মূঢ়।
ঘৃণায় বক্র ভুরু ভূপতির, নয়নে আগুন জ্বলে,
হুকুমে লুটাল বক্‌বক্ খাঁর উষ্ণীষ ধূলিতলে!
ঘোড়া ছেড়ে রাজপথে দাঁড়াইল বদাউন্-সর্দ্দার,
হাতে পায় বেঁধে শিকল, সিপাহী কেড়ে নিল তলোয়ার
কোড়া নিয়ে এল কোড়া-বর্দ্দার বাদশাহী ইঙ্গিতে,
বজ্রকঠোর স্বরে বাদ্‌শার অপরাধী কাঁপে চিতে।
“দোষী সর্দ্দার, ভুল নাহি আর, দোষীর শাস্তি হবে,
রাজার প্রতিভূ রাজার সুনাম ঢেকেছে অগৌরবে।
রাজপুরুষেরা প্রজারে বাঁচাবে চোর-ডাকাতের হাতে,
কে বলো প্রজারে রক্ষিবে রাজপুরুষের উৎপাতে?

রক্ষক যদি হয় ভক্ষক, কে দিবে তাহারে সাজা ?
রাজপুরুষের রাহু-ক্ষুধা হ'তে প্রজারে বাঁচাবে ?—রাজা।
এই তো রাজার প্রধান কর্ম্ম, এ বিধি সুপ্রাচীন,
এই ধর্ম্মের করিব পালন, মানিব না ধনী দীন।
গরীবের প্রাণ, আমিরের প্রাণ, সমান যে জন জানে,
সর্দ্দারী তারি, সুল্‌তানী তারি—দুনিয়ার মাঝখানে ;
গরীবের প্রাণ তুচ্ছ যে মানে অরি তার ভগবান্ ;
কোড়ার প্রহারে প্রাণ যে নিল সে কোড়াতেই দিবে প্রাণ।"
বে-ইমানী সনে রফা ক'রে চলা জানে না মুসলমান ;
কাজে আজ করে সে-কথা প্রমাণ দুনিয়ায় বুল্‌বান্।
বুল্‌বান্ বলে,—"খুনীর খাতির ? হবে না ; হবে না মাফ্,
কসুর করিলে পূরা পাবে সাজা—এই মোর ইন্‌সাফ।"

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

———

রথযাত্রা

বৃদ্ধ খঞ্জ চণ্ডালী এক
শ্রীমুখ দেখিতে রথে
একাকিনী হায় চলে ধীরি ধীরি
মেদিনীপুরের পথে।
দিবসে যে শুধু হাঁটে এক ক্রোশ
তাহার একি গো দায় ;
গৃহ হ'তে দূরে এক শত ক্রোশ
পুরী-ধাম যেতে চায় !
দলে দলে যায় পুরীর যাত্রী
খোঁজ করে কেবা কার ;
সময়ে শ্রীধাম না পারিলে যেতে
ঠাঁই মেলা হবে ভার।
রথ-যাত্রার যবে, শুধু আর
দুই দিন বাকি আছে,
অনেক কষ্টে পঁহুছিল আসি'
সাঁঝে কটকের কাছে ;
"কোথা যাবি বুড়ী ?" পথিক জনেক
সুধালে সেখানে তারে।
বৃদ্ধা বলিল— "চলিয়াছি বাবা
চাঁদমুখ দেখিবারে।"

ঈষৎ হাসিয়া পথিক বলিল,
"কেমনে পারিবি বুড়ী,
রাত পোহালে যে— কাল রথ ক্ষেপী
দেখিবি কেমন করি' ?"
শুনি' চণ্ডালিনী রুষিয়া বলিল,
"বাকি যে এখনো পথ
কি বলিছ তুমি রাতি পোহাইলে
কেমনে হইবে রথ ?"
হাসিয়া পথিক বলিল, "তাই ত
চল্, তাড়াতাড়ি চল্ ;
তুই ক্ষেপী নাহি পঁহুছিলে সেথা
রথ কে টানিবে বল্ ?"
ঘুমাইয়া বুড়ী রজনী প্রভাতে
জেগে বলে "চল যাই" ;
পা দু'টি তাহার বেদনা-জড়িত
উঠিতে শকতি নাই— !
বিষম বেদনা পারে না হাঁটিতে
তবু দিয়া হামাগুড়ি,
রথেতে দেখিবে শ্রীমুখ বলিয়া
চলিতে লাগিল বুড়ী।

ভক্তেরা সব জুটেছে শ্রীধামে
রথযাত্রা যে আজি ;
পতিত-পাবন উঠেছেন রথে
অভিনব বেশে সাজি'।
একি অঘটন একি অলখণ
চলে না দেবের রথ ;
অযুত ভক্ত টানিতেছে রশি,
কর্দ্দমহীন পথ !
জুড়িল হস্তী তবু যে গো রথ
তেমনি রহিল থির ;—
ভাবিয়া আকুল প্রধান পাণ্ডা
ঝরে নয়নের নীর।
ধূলায় লুটায়ে পড়িল পাণ্ডা
জানিতে পারিল ধ্যানে ;—
প্রধান ভক্ত কে এক রথের
পশ্চাৎ দিকে টানে।
যাবৎ না ছোঁয়ে সম্মুখ-রশি
পূত-করতল তার—
হাজার হস্তী রথের চক্র
নড়াতে নারিবে আর !

বাহির হইল পাণ্ডার দল
ভক্ত অন্বেষণে;
কৌপীন পরা সন্ন্যাসী আনে
বৈষ্ণব সাধুজনে।
তিলক-ভূষিত নামাবলী ধারী
ব্রাহ্মণ আনে ধ'রে;
কাহারো পরশে সে বিরাট্ রথ
এক তিল নাহি নড়ে।
খুঁজিতে খুঁজিতে কত দূরে আসি'
প্রধান পাণ্ডা হায়।
দেখিল খঞ্জ বৃদ্ধা জনেক
পুরী অভিমুখে ধায়।
হামাগুড়ি দিয়া চলিয়াছে বুড়ী
পাণ্ডা শুধালে তারে—
প্রখর রৌদ্রে ভিক্ষার লাগি'
যাইবে কাহার দ্বারে?—
তপ্ত বালুতে পুড়িতেছে পদ
আঁখি ভ'রে গেছে জলে;
দিনু এই সিকি ফিরে গিয়ে ব'স
ওই অশথের তলে।"

বুড়ী বলে "বাবা বল কবে রথ
পয়সাতে কাজ নাই ;
রথেতে দেখিব শ্রীমুখ বলিয়া
রোদ ঝড় মানি নাই।"
শুনি' ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে
বৃদ্ধারে বুকে ধরি'—
"পেয়েছি পেয়েছি" বলিয়া ছুটিল
পুরীর সড়ক ধরি'।
স্তম্ভিতা বৃদ্ধা বলে "দাও ছাড়ি'
বাবা গো চাঁড়ালী মুই !"
ব্রাহ্মণ বলে, "দে মা পদধূলি
গুরুরো গুরু যে তুই !"
চকিতে দেখিল যাত্রীরা সবে
"জয় জয় জয়" ব'লে
প্রধান পাণ্ডা আনিল রে এক
খোঁড়া বুড়ী ল'য়ে কোলে।
অচল সে রথ চলিতে লাগিল
বুড়ী দিল যবে হাত ;—
উল্লাসে সবে উঠিল বলিয়া
"জয় জয় জগন্নাথ !"

সাশ্রু নয়নে অযুত কণ্ঠে
গাহিল অযুত প্রাণ ;—
"সত্যই তুমি কাঙ্গালের হরি
ভক্তের ভগবান !"

—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বর্ষ-আবাহন

তুমি কে ! তুমিই কি গো নব-যাদুকর
নববর্ষ ! আশা-দ্বীপ অকূল পাথারে !
এস হে মঙ্গলবাদ্য হাহার আগারে,—
বান্ধবহীনের বন্ধু ! আইস সত্বর !
বরিষ কুসুমরাশি—এ মরু-উপর ;
নিবাও এ ধূ ধূ চিতা শান্তির আগারে ;
খেলাও মলিন ওষ্ঠে হাসির লহর ;
জাগাও শোণিত সুপ্ত ধমনী-মাঝারে !
যা' হ'বার হ'য়ে গেছে,—ভুলিয়া কাহিনী
আগেকার,— বিশ্বাসিব মোরাও তোমারে।
তুমি যেন হে সুন্দর ! কুৎসিত আচারে
দিও না আননে তব কলঙ্ক-লেপনি।
নিতি নিতি নব বেশে হাসে উষা সতী,—
রহিও চির-তরুণ তুমিও তেমতি !

আকুঞ্চিত রেখা পড়ে ললাট-প্রাঙ্গণে
যুবকের ; শুভ্র হয় কৃষ্ণকেশ-হার।
তা' ব'লে কি যাদুকর ! বরিষা দুর্দ্দিনে
শুনাতে নারিবে তুমি কোকিল-ঝঙ্কার,

আকুলি' মরম-গ্রাহী দিগঙ্গনাগণে ?
তা' ব'লে কি যাছকর, হেমন্ত-তুষার,
ধবলিলে কেশ তব নিঠুর-বর্ষণে,
রবে না তরুণ ওই হৃদয় তোমার ?
কনক-গ্যাঁদার রাশি নাহি কি ফুটিবে ?
নাহি কি লুটিবে অলি দোপাটির বাস ?
সুন্দর শশক-শ্রেণী নাহি কি ছুটিবে,
ঝোপ হ'তে, ইতি-উতি, পাইয়ে তরাস ?
হে বর্ষ ! যদিও কালে রূপ হ্রাস হয়,—
রেখ, রেখ, চির-নব তরুণ হৃদয় !

আকালিক ধূমকেতু হইলে উদয়,
হয় যথা হত্যাকাণ্ড, রোদনের রোল,
"হা-অন্ন হা-অন্ন" রবে, করি' গণ্ডগোল,
কাঁদে শিশু যুবা বৃদ্ধ হ'য়ে নিরাশ্রয় ;
শ্রীভ্রষ্টা বসুধা আহা পতিহীনা হয়—
তেমন রাক্ষস ভাব করিয়ে ধারণ,
হে বর্ষ ! এ আনন্দের চারু নিকেতন
কোর না, কোর না, যেন মরুর নিলয় ।

ধন-ধান্যে ভ'রে দিয়ো ইন্দিরার ঝাঁপি ;
বাণীর প্রসাদ হোক্ নর-নারী 'পর !
কাঙাল-নয়নে আর যেন না বিলাপী
মুছে অশ্রু ; মন্ত্রে তব ওহে যাদুকর !
সৃজ হ্রদ, নদী, নদ, পুষ্প-উপবন,—
ব্যাপিয়া এ সুখময় মানব-জীবন !

—দেবেন্দ্রনাথ সেন

———

নববর্ষ

অশোকের বীরবোলী দোলে তব কাণে !
বালার্কের ফোঁটা তব ভালে !
কে গো তুমি দাঁড়াইয়া, বিজন উদ্যানে ?
হাসি রাশি নয়ন-বিশালে !
পীত ধড়া, পীত তনু, অধরে বাঁশরী,
কি গাহিছ, হে কুহকি, প্রাণ-মন হরি' ?

অপূর্ব্ব এ বৃন্দাবন সৃজিলে নিমেষে,
কে গো তুমি দেব বংশী-ধারী !
মুরলীর গান-রসে আনন্দ আবেশে,
মুগ্ধ স্তব্ধ যত নরনারী !
আম্র-মুকুলের মালা দোলে তব গলে
সুরভি-বকুল-বাস নিশ্বাসে উথলে।
বংশীর সুধার ধারা গলি' গলি' পড়ে,
কি হরষ, হে নব বরষ !
ধরিত্রীর মুখে আজি আনন্দ না ধরে,
পেয়ে তব মঙ্গল-পরশ !
শ্যামাঙ্গী প্রবীণা ধনী, প্রাচীনা অবনি,
স্পর্শে তব, গৌরবর্ণা, তরুণা রমণী !

অসাড় বাঙ্গালি-প্রাণ, শ্লথ এ রুধির,
হে কুহকি, শুনি' তব গান,
জাগিয়াছে সাধ প্রাণে, হ'য়ে ভক্ত-বীর,
সাধিবারে বঙ্গের কল্যাণ!

'ভক্তি দুর্গাপূজা-পর্ব্বে, সুপুত্র সাজিয়া,
পূজিব রাতুল পদ, পুলকে মাতিয়া!
হে বরষ, শত হস্তে উদ্যমের লাটি,
শত হস্তে উৎসাহের ঢাল,
সাজাইব পূজা-মঞ্চ, অতি পরিপাটী,
পরাভক্তি-দেবীর ছাবাল।
হে বরষ, তোমার ও বৈশাখী পরশে,
নিদ্রিত বঙ্গের প্রাণ জেগেছে হরষে!

—দেবেন্দ্রনাথ সেন

———

মজার মুলুক

এক যে আছে মজার দেশ—
সব রকমে ভালো,
রাত্তিরেতে বেজায় রোদ
দিনে চাঁদের আলো !

আকাশ সেথা সবুজ বরণ,
গাছের পাতা নীল,
ডাঙায় চরে রুই কাৎলা
জলের মাঝে চিল !

সেই দেশেতে বেড়াল পালায়
নেঙ্‌টি ইঁদুর দেখে,
ছেলেরা খায় ক্যাষ্টর অয়েল্‌
রসগোল্লা রেখে !

মণ্ডা মিঠাই তিতো সেথা
ওষুধ লাগে ভালো,
অন্ধকারটা সাদা দেখায়,
সাদা জিনিস কালো !

ছেলেরা সব খেলা ফেলে
বই নে বসে পড়ে,

মুখে লাগাম দিয়ে ঘোড়া
লোকের পিঠে চড়ে !

ঘুড়ির হাতে বাঁশের লাটাই
উড়্‌তে থাকে ছেলে,
বঁড়্‌শি দিয়ে মানুষ গাঁথে
মাছেরা ছিপ্‌ ফেলে !

জিলিপী সে তেড়ে এসে
কামড় দিতে চায়,
কচুরি আর রসগোল্লা
ছেলে ধরে খায় !

পায়ে ছাতি দিয়ে লোকে
হাতে হেঁটে চলে,
ডাঙ্গায় ভাসে নৌকা জাহাজ,
গাড়ী ছোটে জলে।

মজার দেশের মজার কথা
বলবো কত আর,
চোখ খুল্‌লে যায় না দেখা—
মুদ্‌লে পরিষ্কার !

—যোগীন্দ্রনাথ সরকার

কালাপাহাড়

শুনিছ না—ওই দিকে দিকে কাঁদে রক্ত-পিশাচ প্রেতের দল!
শবভুক্ যত নিশাচর করে জগৎ জুড়িয়া কী কোলাহল!
দূর-মশালের তপ্ত-নিশাসে ঘামিয়া উঠিছে গগন-শিলা!
ধরণীর বুক থরথরি' কাঁপে—একি তাণ্ডব নৃত্য-লীলা!
এতদিন পরে উদিল কি আজ সুরাসুরজয়ী যুগাবতার?—
মানুষের পাপ করিতে মোচন, দেবতারে হানি' ভীম প্রহার,
—কালাপাহাড়!

কতকাল পরে আজ নর-দেহে শোণিতে ধ্বনিছে আগুন-গান!
এতদিন শুধু লাল হ'ল বেদী—আজ তার শিখা ধূমায়মান!
আদি হ'তে যত বেদনা জমেছে—বঞ্চনাহত ব্যর্থশ্বাস—
ওই উঠে তারি প্রলয়-ঝটিকা, ঘোর-গর্জ্জন মহোচ্ছ্বাস!
ভয় পায় ভয়! ভগবান ভাগে!—প্রেতপুরী বুঝি হয় সাবাড়!
ওই আসে—তার বাজে দুন্দুভি, তামার দামামা, কাড়া-নাকাড়!
—কালাপাহাড়!

কোটী-আঁখি-ঝরা অশ্রু-নির্ঝর ঝরিল চরণ-পাষাণ-মূলে,
ক্ষয় হ'ল শুধু শিলা চত্বর—অন্ধের আঁখি গেল না খুলে!
জীবের চেতনা জড়ে বিলাইয়া আঁধারিল কত শুক্ল নিশা!
রক্ত-লোলুপ লোল-রসনায় দানিল নিজেরি অমৃত-তৃষা!

আজ তারি শেষ! মোহ অবসান!—দেবতা-দমন যুগাবতার
আসে ওই! তার বাজে দুন্দুভি—বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়!
—কালাপাহাড়!

বাজে দুন্দুভি, তামার দামামা—বাজে কি ভীষণ কাড়া-নাকাড়!
অগ্নি-পতাকা উড়িছে ঈশানে, দুলিছে তাহাতে উল্কা-হার!
অসির ফলকে অশনি ঝলকে—গলে' যায় যত ত্রিশূল-চূড়া!
ভৈরব রবে মূর্চ্ছিত ধরা, আকাশের ছাদ হয় বা গুঁড়া!
পূজারী অথির, দেবতা বধির—ঘণ্টার রোলে জাগেনা আর!
অরাতির দাপে আরতি ফুরায়—নাম শুনে হয় বুক অসাড়!
—কালাপাহাড়!

নিজ হাতে পরি' শিকলি দু'পায়, দুর্ব্বল করে যাহারে নতি,
হাত জোড় করি' যাচনা যাহারে, আজ হের তার কি দুর্গতি!
কোথায় পিনাক? ডমরু কোথায়? কোথায় চক্র সুদর্শন?
মানুষের কাছে বরাভয় মাগে মন্দির-বাসী অমরগণ!
ছাড়ি' লোকালয় দেবতা পলায় সাত-সাগরের সীমানা-পার!
ভয়ঙ্করের ভুল ভেঙ্গে যায়! বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়,
—কালাপাহাড়!

কল্প-কালের কল্পনা যত, শিশু-মানবের নরক ভয়—
নিবারণ করি' উদিল আজিকে দৈত্য-দানব-পুরঞ্জয়!

দেহের দেউলে দেবতা নিবসে—তার অপমান দুর্ব্বিষহ!
অন্তরে হ'ল বাহিরের দাস মানুষের পিতা প্রপিতামহ!
স্তম্ভিত হৃদ্‌পিণ্ডের 'পরে তুলেছে অচল পাষাণ-ভার—
সহিবে কি সেই নিদারুণ গ্লানি মানবসিংহ যুগাবতার
—কালাপাহাড়!

ভেঙ্গে ফেল মঠ-মন্দির-চূড়া, দারু-শিলা কর নিমজ্জন!
বলি—উপচার ধূপ-দীপারতি রসাতলে দাও বিসর্জ্জন!
নাই ব্রাহ্মণ, ম্লেচ্ছ-যবন, নাই ভগবান—ভক্ত নাই,
যুগে যুগে শুধু মানুষ আছে রে! মানুষের বুকে রক্ত চাই
ছাড়ি' লোকালয় দেবতা পলায় সাত-সাগরের সীমানা-পার!
ভয়ঙ্করের ভয় ভেঙ্গে যায়,—বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়?
—কালাপাহাড়!

ব্রাহ্মণ-যুবা যবনে মিলেছে, পবন মিলেছে বহ্নিসাথে!
এ কোন্ বিধাতা বজ্র ধরেছে নবসৃষ্টির প্রলয়-রাতে!
মরুর মর্ম্ম বিদারি' বহিছে সুধার উৎস পিপাসাহরা!
কল্লোলে তার বন্যার রোল!—কূল ভেঙ্গে বুঝি ভাসায় ধরা!
ওরে ভয় নাই!—মুকুটে তাহার নবারুণ-ছটা, ময়ূখ-হার!
কাল-নিশীথিনী লুকায় বসনে!—সবে দিল তাই নাম তাহার
—কালাপাহাড়!

শুনিছ না ওই—দিকে দিকে কাঁদে রক্ত-পিশাচ প্রেতের পাল!
দূর-মশালের তপ্ত-নিশাসে ঘামিয়া উঠিছে গগন-ভাল!
কার পথে-পথে গিরি নুয়ে যায়! কটাক্ষে রবি অস্তমান!
খড়্গ কাহার থির-বিদ্যুৎ! ধূলি-ধ্বজা কার মেঘ-সমান!
ভয় পায় ভয়! ভগবান ভাগে! প্রেতপুরী বুঝি হয় সাবাড়
ওই আসে! ওই বাজে দুন্দুভি—বাজায় দামামা, কাড়া-নাকাড়
—কালাপাহাড়!

—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

দেখব এবার জগৎটাকে

থাক্‌বনাকো বদ্ধ ঘরে, দেখ্‌ব এবার জগৎটাকে,
কেমন ক'রে ঘুর্‌ছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।
দেশ হ'তে দেশ দেশান্তরে ছুট্‌ছে তারা কেমন ক'রে!
কিসের নেশায় কেমন ক'রে মর্‌ছে বা বীর লাখে লাখে,
কিসের আশায় কর্‌ছে তারা বরণ মরণ-যন্ত্রণাকে!

কেমন ক'রে বীর ডুবুরি সিন্ধু সেচে মুক্তা আনে,
কেমন ক'রে দুঃসাহসী চল্‌ছে উড়ে স্বর্গপানে।
জাপ্‌টে ধ'রে ঢেউয়ের ঝুঁটি যুদ্ধ-জাহাজ চল্‌ছে ছুটি',
কেমন ক'রে আন্‌ছে মাণিক বোঝাই ক'রে সিন্ধু-যানে,
কেমন জোরে টান্‌লে সাগর উথ্‌লে ওঠে জোয়ার-বানে।

কেমন ক'রে মথ্‌লে পাথার লক্ষ্মী ওঠেন পাতাল ফুঁড়ে,
কিসের অভিযানে মানুষ চল্‌ছে হিমালয়ের চূড়ে,
তুহিন-মেরু পার হ'য়ে যায় সন্ধানীরা কিসের আশায়?
হাউই চ'ড়ে চায় যেতে কে চন্দ্রলোকের অচিন পুরে,—
শুন্‌ব আমি ইঙ্গিত কোন্ মঙ্গল হ'তে আস্‌ছে উড়ে।

রইবনাকো বদ্ধ খাঁচায়, দেখ্‌ব এ-সব ভুবন ঘুরে,
আকাশ-বাতাস-চন্দ্র-তারায় সাগর-জলে পাহাড়-চূড়ে।
আমার সীমার বাঁধন টুটে' দশ দিকেতে পড়্‌ব লুটে'
পাতাল ফেড়ে নাম্‌ব নীচে, উঠ্‌ব আবার আকাশ ফুঁড়ে।
বিশ্ব-জগৎ দেখ্‌ব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে'!

—কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম

কুলি-মজুর

দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি ব'লে এক বাবুসা'ব তারে ঠেলে দিল নীচে ফেলে।
চোখ ফেটে এলো জল,
এম্‌নি ক'রে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্ব্বল ?
যে দধীচিদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প-শকট চলে,
বাবুসা'ব এসে চড়িল তাহাতে, কুলিরা পড়িল তলে।
বেতন দিয়াছ ?—চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল।
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোর পেলি বল্‌।
রাজ-পথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প-শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বলত এসব কাহাদের দান ! তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা ?—ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইটে আছে লিখা !
তুমি জানো না কো, কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে,
ঐ পথ, ঐ জাহাজ, শকট, অট্টালিকার মানে !

আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ।
হাতুড়ি শাবল গাঁইতি চালায়ে ভাঙ্গিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দু-পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,

তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর মুটে ও কুলি,
তোমারে বাহিতে যারা পবিত্র অঙ্গে লাগাল ধূলি,
তারাই মানুষ তারাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান !
তুমি শুয়ে রবে তেতালার 'পরে আমরা রহিব নীচে,
অথচ তোমারে দেবতা বলিব, সে ভরসা আজ মিছে।
সিক্ত যাদের সারা দেহ মন মাটির মমতা-রসে,
এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরি বশে !
তারি পদরজ অঞ্জলি করি' মাথায় লইব তুলি,
সকলের সাথে পথে চলি' যার পায়ে লাগিয়াছে ধূলি।
আজ নিখিলের বেদনা-আর্ত্ত পীড়িতের মাখি' খুন,
লালে লাল হ'য়ে উদিছে নবীন প্রভাতের নবারুণ !
আজ হৃদয়ের জাম-ধরা যত কবাট ভাঙ্গিয়া দাও !
রঙ্-করা ঐ চামড়ার যত আবরণ খুলে দাও !
আকাশের আজ যত বায়ু আছে হইয়া জমাট নীল,
মাতামাতি ক'রে ঢুকুক্ এ বুকে, খুলে দাও যত খিল !
সকল আকাশ ভাঙিয়া পড়ুক্ আমাদের এই ঘরে
মোদের মাথায় চন্দ্র সূর্য্য তারারা পড়ুক্ ঝ'রে !
সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষ আসি',
এক মোহানায় দাঁড়াইয়া শোন এক মিলনের বাঁশী।

একজনে দিলে ব্যথা !
সমান হইয়া বাজে সে বেদনা সকলের বুকে হেথা !
একের অসম্মান
নিখিল মানব-জাতির লজ্জা—সকলের অপমান !
মহা-মানবের মহা-বেদনার আজি মহা উত্থান,
উর্দ্ধে হাসিছে ভগবান, নীচে কাঁপিতেছে শয়তান !

—কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম

সাধ

সাধ হয়েচে কর্‌ব আমি এক জাহাজের লস্কার,
জান্‌বে না মা, লুকিয়ে কখন্ পালিয়ে যাব ফস্ করি'!
নীলসাগরের নেই চোখে ঘুম,
ফুট্‌চে সাদা ফেনার কুসুম,
কর্‌চে তিমি কুল্‌কুচো আর হাঙর সাঁতার কাটে!
তুমি তখন ভাব্‌বে আমায় শুয়ে তোমার খাটে।

আফ্রিকাতে গহন বনে হটেণ্টটের গান চলে!
ন্যাংটা জুলুর নাচন দেখে' 'হিপো'রা দ্যায় ঝাঁপ জলে।
উষ্ট্র পাখীর পৃষ্ঠে উঠে
সাহারাতে চল্‌ব ছুটে,
গণ্ডার, উট, গরিলা আর সিঙ্গি-মামার সঙ্গে,
ডঙ্কা মেরে শঙ্কা ভুলে খেল্‌ব শিকার রঙ্গে!

দেখ্‌ব মাগো, ছ'-মাস-রাতি ছ'-মাস-দিনের দেশ কোথা,
কোন্ 'অরোরা বোরিয়ালিস্' কর্‌চে চাঁদের মুখ ভোঁতা!
এস্‌কুইমোর দেশে গিয়ে,
বরফ-ঘরে হামা দিয়ে
ঢুক্‌ব আমি পর্‌ব গায়ে চাম্‌ড়া-লোমের পোষাক,
বর্শা ছুঁড়ে সিন্ধু-ঘোড়ার কর্‌ব মাথা দো-ফাঁক্!

আমেরিকায় পৌঁছে মাগো, লাল-মানুষের মুল্লুকে,
পালোক-টুপী চড়িয়ে মাথায় কর্‌ব তাড়া ভাল্লুকে।
'কাউ-বয়'দের সাথে জুটে'
লড়্‌ব ঘোড়ার ওপর উঠে',
অ্যামাজনের অগাধ জলে ডোঙায় চ'ড়ে ভাস্‌ব,
জাগুয়ার আর টেপির দেখে আমোদ ক'রে হাস্‌ব।

তাই ব'লে মা ভুল্‌বনাকো মঞ্জুমালা বোনটিকে!
গলিভারের 'সেই লিলিপুট্',—দেখ্‌ব সে দেশ কোন্‌দিকে!
আন্‌ব আমি খাঁচায় ক'রে,
আঙুল-প্রমাণ মানুষ ধ'রে,
খুকু তোমার হাস্‌বে কত, হাতে তাদের পেলে,—
কাঁচের পুতুল চাইবে না আর মানুষ পুতুল ফেলে!

চুপটি ক'রে ঘরের কোণে থাক্‌তে বড় প্রাণ কাঁদে,
মাগো আমায়, জগতে দাও ছুট্‌তে মনের আহ্লাদে!
দেখ্‌বে কেমন তোমার ছেলে
যাচ্ছে সাগর—পাহাড় ঠেলে,
বেদুইনের কাড়্‌চে ঘোড়া, কর্‌চে মরু তুচ্ছ!
বুনো হাতী খেদিয়ে হেলায় ধর্‌চে বাঘের পুচ্ছ!

—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

দিক্‌বিজয়ী পণ্ডিত এক আসিয়াছে ব্রজধামে,
যেন রণমদে মত্ত দন্তী পঙ্কজ-বনে নামে।
অশ্ব-পৃষ্ঠে ঝাণ্ডা উড়ায়ে চারণ ফুকারি' চলে,
চতুর্দ্দোলায় পণ্ডিত চলে মুক্তার মালা গলে।
পরাজিত শত পণ্ডিত চলে নতশিরে পাছে-পাছে,
ভয়ে সবে পুঁথি পত্র গুটায়, কেহ না আগায় কাছে।
রূপ সনাতন রহেন দু'জন সাধন-ভজনে রত,
কে আসে, কে যায়—ব্রজে তার খোঁজ রাখেন না অত শত।
পাণ্ডিত্যের খ্যাতি তাঁহাদের রটিয়াছে দেশে দেশে,
বিজয় দস্যু পণ্ডিত তাই শুনেছে মথুরা এসে।

হরিনামে ম'জে দুই ভাই ব্রজে বিভোর আছেন সুখে,
"যুদ্ধং দেহি" বলিয়া দাঁড়াল সে তাঁদের সম্মুখে।
বিনা তর্কেই হেসে দুই ভাই, বসাইয়া সমাদরে।
বিজয়-পত্রী লিখিয়া দিলেন জয়-ভিখারীর করে।
মূঢ় পণ্ডিত ভাবিতে লাগিল—গর্ব্বে আত্মহারা,
বিনা বিচারেই ভয়ে পরাজয় মানিয়া নিলেন তাঁরা।
বিজয়-গর্ব্বে তূর্য্য বাজায়ে পণ্ডিত যায় ফিরে,
সূর্য্য তখন মাথার উপরে উঠিতেছে ধীরে ধীরে।

পথের জনতা ভয়ে-বিস্ময়ে দু'ধারে দাঁড়ায় সরি'
শ্রীজীব তখন যমুনা হইতে ফিরিছেন স্নান করি'।
সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন জীব শুনিয়া আস্ফালন,
'বিনা বিচারেই হার মেনেছেন রূপ আর সনাতন';
শুনি' শ্রীজীবের ধৈর্য্য টলিল, বলিলেন—"পণ্ডিত,
এস, দিব আমি তব দম্ভের প্রতিফল সমুচিত।
যাদেরে জিনেছ বলি' দাম্ভিক এত তব অভিমান,
তাঁদের আমি ত চরণাশ্রিত শিষ্য ও সন্তান;
পাইয়াছি আমি তাঁহাদের জ্ঞান-সিন্ধুর অঞ্জলি,
মোরে পরাজয় কর, পরে যেও বিজয়-গর্ব্বে চলি'।"

তরুণ যুবার কণ্ঠে শুনিয়া রণে আহ্বান-বাণী,
অট্টহাস্য হাসিয়া উঠিল পণ্ডিত অভিমানী;
বলিল—"মূর্খ, সিংহ কি কভু ক্ষুদ্র শৃগালে বধে ?
পারাবার পার হ'য়ে এসে শেষে ডুবিব কি গোষ্পদে ?"
বাহকগণেরে বলিল সে, "চল্, কেন গেলি তোরা থেমে।"
জীব বলিলেন—"রহ দাম্ভিক, দোলা হ'তে এস নেমে।"

তর্ক বাধিল যমুনার তীরে, দলে দলে সেথা আসি'
ঘেরিয়া দাঁড়া'ল দুই মল্লেরে যত সব পুরবাসী।

হানিতে লাগিল পণ্ডিত শত শাণিত প্রশ্নবাণ,
শ্রীজীব হাসিয়া হেলায় সে-সব করিলেন খান-খান।
দুই দণ্ডেই দণ্ড লভিল পণ্ডিত দাম্ভিক,
ব্রজবাসিগণ বলিতে লাগিল চীৎকারি' ধিক্ ধিক্।"
পরাজিত হ'য়ে দিগ্‌জয়ী বীর ম্লানমুখে নতশিরে,
ধ্বজা গুটাইয়া সোজা পলাইল মথুরার দিকে ফিরে।
ব্রজবাসী সব তুলি' কলরব পুলকিত অন্তরে,
রূপ সনাতনে জানাল এ কথা পরমোৎসাহভরে।
সিক্ত বসন শুকায়েছে গায়, তৃতীয় প্রহর বেলা,
আরো দেরী হ'লো ফিরিতে জীবের ঠেলি' জনতার মেলা।
কুঞ্জে ফিরিয়া দেখেন রূপের গম্ভীর মুখখানি,
ভাবিলেন ভয়ে, আজি অদৃষ্টে কি যে আছে নাহি জানি!
কুঞ্জে তখনো গ্রহণ করেনি কেহই অন্নজল,
বলিলেন রূপ, "জীব, পিছে তব এত কেন কোলাহল?
শুনিয়াছি সব, আজি হ'তে তুমি নও মোর সন্তান,
বৈষ্ণব হ'য়ে ত্যজিতে পারনি আজো মূঢ় অভিমান?
যশ-প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা মেখে এলে তুমি তাই,
আজি হ'তে তব মুখ দেখিব না, হেথা নাই তব ঠাঁই।"

চরণে পড়িয়া শ্রীজীব কতই করিলেন অনুনয়,
রূপের হৃদয় গলিল না তায়, কোপের হ'লো না ক্ষয়।

শ্রীজীব তখন যমুনার তীরে তমাল-তরুর তল,
আশ্রয় করি' রহিলেন পড়ি' তেয়াগি' অন্নজল।
দর-দর তার চোখে ধারা বয়, ফুলে' ফুলে' উঠে বুক,
শ্রীহরির নাম করে অবিরাম বসনে ঢাকিয়া মুখ।
শ্রীজীবের দশা দেখে সনাতন হৃদয়ে পেলেন ব্যথা,
বজ্রের মত বাজিল পরাণে শ্রীজীবের কাতরতা।
বিরূপ শ্রীরূপে কহিলেন চুপে, "শ্রীজীবে ত্যজিলে কেন?
বৈষ্ণব হ'য়ে কেন বা তোমার বিকৃত বুদ্ধি হেন?
গুরু-মর্য্যাদা রক্ষা করাই ছিল তার মনে সাধ,
আমি ত দেখিনা এর বেশী কিছু গুরুতর অপরাধ।"

রূপ কহিলেন—"বুঝাবার ভাই আছে কিছু প্রয়োজন?
বৈষ্ণব হ'য়ে অভিমান আজো করেনি সে বর্জ্জন।
তরু হ'তে যেবা হয় সহিষ্ণু, তৃণ হ'তে দীনতর,
সেই বৈষ্ণব,—তর্ক-বিজয়ে ভাবে না সে কভু বড়।
গুরু-মর্য্যাদা? গুরুরেও সে ত চিনে নাই ঠিক মত,
পণ্ডিত হ'য়ে পণ্ড হয়েছে তাহার সাধনা যত।"

সনাতন তায় হেসে বলিলেন—"জিনিবারে অভিমান
পারে নাই জীব,—এখনও বালক—আমাদেরি সন্তান।

তুমি তার তাত, তুমি তার গুরু, পারিলে না আজো হায়,
বৈষ্ণব হ'য়ে ক্রোধ জিনিবারে, অপরাধ নাই তায় ?
সেই অপরাধে ত্যজিব তোমারে ? দীনতার অভিমান
—তাও অভিমান, বৈষ্ণব-মনে তাও পাবে কেন স্থান ?
সেই অভিমান থাকে যদি মনে বৈষ্ণব মোরা নই ;
জীবে দয়া তব পরম ধর্ম্ম, 'জীবে' দয়া তব কই ?"

একথা শুনিয়া চমকি' উঠিয়া রূপ কহিলেন কাঁদি,'
"কি কথা শুনালে, হায় তার চেয়ে আমিই ত অপরাধী !
বৈষ্ণব হ'য়ে ক্ষমা করিতে ত পারিনিক সন্তানে,
না বুঝে হায়রে বজ্র হেনেছি জীবের কোমল প্রাণে !
যাও ভাই, যাও—এক্ষনি গিয়ে ডেকে নিয়ে এস তারে,
না জানি কত-না যাতনা পায় সে এ-মূঢ়ের অবিচারে !"

সনাতন-সাথে শ্রীজীব এলেন কঙ্কাল-সার দেহ,
অরুণ নয়ন, ছিন্ন বসন—চিনিতে পারে না কেহ,
জীবে বুকে ধরি' কাঁদিলেন রূপ অবুঝ শিশুর মত,
বার-বার তাঁর ললাট চুমিয়া জুড়ায়ে দিলেন ক্ষত।
দিগ্‌বিজয়ীর পরশে অশুচি বৃন্দাবনের ধূলি,
শুচি হ'লো পেয়ে চারি চক্ষের অশ্রু-মুকুতাগুলি।

—শ্রীকালিদাস রায়

বাসুদেব

কোথা তুমি যুগ-সূর্য্য, ধ্বনিয়া অভয় তূর্য্য—
এস নেমে সার্ব্বভৌম, হে শ্রেষ্ঠ মানব !
ধর্ম্ম আজি গ্লানিভরা, নির্য্যাতিত নরনারী,
বিজ্ঞানের যজ্ঞভূমে উদগ্র দানব।
তব অভ্যুত্থান লাগি' যুগযুগান্তর বীর,
অধীর ধরণী ধৃত, ব্যগ্র প্রতিক্ষণ,
এস শৌরি শার্ঙ্গপাণি, নির্ঘোষিয়া পাঞ্চজন্য ;
বিশ্বম্ভর, চতুর্ভুজে ধরো সুদর্শন !

বর্ব্বরের বজ্রবাণ সমুদ্যত উর্দ্ধলোকে
মৃত্যু হানে বিষ-বাষ্প নভোবক্ষ ভেদি'
দুর্ব্বার সংহার-বৃত্তি কীর্ত্তি নাশে মহত্ত্বের
ধ্বংস মাগে মনু-বংশ নিজ কণ্ঠ ছেদি' !
হিংসার লেলিহ-বহ্নি দগ্ধ করে চারিদিক
জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত অগ্নিকণা,
নাশ' এই নিষ্ঠুরতা গদাঘাতে গদাধর,
ভস্ম কর ভুজঙ্গের কূট-চক্র ফণা।

আবির্ভূত হও বিষ্ণু ! বসুধার ব্যাভিচার,
দুর্নীতির দুঃশাসন বিচূর্ণিত করি',

আলস্য জড়তা দৈন্য, দুর্ব্বলের অক্ষমতা,
ভীরুতার ভয়-ক্লেদ দূরে অপহরি'।
পৌরুষের পঞ্চতপে জাগাও ক্ষত্রিয় বীর্য্য
শৌর্য্য হীন সৌরগ্রহ মৃত্তিকার বুকে ;
শুনাও উদাত্ত কণ্ঠ মৃত্যুভয়-হর-গীতা
প্রাণদীপ্তি এনে দাও ম্লান-মূক মুখে।

পরুষ পরশু ধরি' সম্ভব' এ যুগে পুন
শক্তির মূঢ়তা নাশি' কর খান খান,
দুর্দ্ধর্ষ সংঘাতে পিষ্ট ক্লিষ্ট এই বসুন্ধরা
লভুক নূতন রূপ, নব-সৃষ্ট প্রাণ ;
মানুষ ফিরিয়া পাক্ অন্তরের দেবতারে,
দম্ভ-স্ফীত অহঙ্কার ঘুচুক্ তাহার,
লুপ্ত হোক্ বিদ্বেষের বিভীষিকা বৈরাচার
হ্রস্ব হোক্ ধরিত্রীর দুঃসহ ভূভার।

সত্য-শিব-সুন্দরের স্পর্শে হোক্ চিত্ত শুচি
দাও মুছি' মালিন্যের রুক্ষ ধূলি-জাল,
মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্য স্তব্ধ হোক্ মর্ত্ত্যলোকে—
অমৃতের মহামন্ত্র দিক্ মহাকাল।

সাম্য মৈত্রী অভেদের দীক্ষা দাও জনে-জনে।
খণ্ড ছিন্ন ভূমণ্ডলে হে পার্থ-সারথী!
বিসর্জ্জিয়া তুচ্ছ স্বার্থ সঙ্কীর্ণ স্বাজাত্যবোধ
শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্তিলাভে হোক্ বিশ্ব ব্রতী।

—শ্রীনরেন্দ্র দেব

———

চোর-ধরা

আরে ছি ছি! রাম রাম! ব'লো না হে ব'লো না—
চল্‌ছে যা জুয়াচুরি, নাহি তার তুলনা।
যেই আমি দেই ঘুম টিফিনের আগেতে,
ভয়ানক ক'মে যায় খাবারের ভাগেতে!
রোজ দেখি খেয়ে গেছে, জানিনেকো কারা সে—
কাল্‌কে যা হ'য়ে গেল ডাকাতির বাড়া সে!
পাঁচখানা কাট্‌লেট্‌, লুচি তিন গণ্ডা,
গোটা দুই জিবে গজা, গুটি দুই মণ্ডা,
আরো কত ছিল পাতে আলুভাজা ঘুঙ্‌নি—
ঘুম থেকে উঠে দেখি পাতখানা শূন্যি!
তাই আজ ক্ষেপে গেছি—কত আর পার্‌ব?
এতদিন স'য়ে স'য়ে এইবারে মার্‌ব।
খাড়া আছি সারাদিন হুঁসিয়ার পাহারা,
দেখে নেব রোজ রোজ খেয়ে যায় কাহারা।
রামু হও, দামু হও, ওপাড়ার ঘোষ বোস্‌—
যেই হও এইবারে থেমে যাবে ফোঁস্‌ ফোঁস্‌।
খাট্‌বে না জারি জুরি আঁট্‌বে না মার্‌প্যাঁচ্‌,
যারে পাব ঘাড়ে ধ'রে কেটে দেব ঘ্যাঁচ্‌ ঘ্যাঁচ্‌।
এই দেখ ঢাল নিয়ে খাড়া আছি আড়ালে,
এইবারে টের পাবে মুণ্ডুটা বাড়ালে।
রোজ বলি 'সাবধান'! কাণে তবু যায় না?
ঠেলাখানা বুঝ্‌বি ত এইবারে আয় না!

—সুকুমার রায়

গোঁফ চুরি

হেড্ অফিসের বড় বাবু লোকটি বড় শান্ত,
তার যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখন জান্‌ত ?
দিব্যি ছিলেন খোশ-মেজাজে চেয়ারখানি চেপে,
একলা ব'সে ঝিম্‌ঝিমিয়ে হঠাৎ গেলেন ক্ষেপে !
আঁৎকে উঠে হাত-পা ছুঁড়ে চোখটি ক'রে গোল,
হঠাৎ বলেন, "গেলুম গেলুম, আমায় ধ'রে তোল্" !
তাই শুনে কেউ বদ্যি ডাকে, কেউবা হাঁকে পুলিশ,
কেউবা বলে, "কাম্‌ড়ে দেবে সাবধানেতে তুলিস্" !
ব্যস্ত সবাই এদিক-ওদিক কর্‌ছে ঘোরাঘুরি,
বাবু হাঁকেন, "ওরে আমার গোঁফ গিয়েছে চুরি" !
গোঁফ হারান ! আজব কথা ! তাও কি হয় সত্যি
গোঁফ জোড়া তো তেম্‌নি আছে, কমেনি এক রত্তি ।
সবাই তাঁরে বুঝিয়ে বলে, সাম্‌নে ধ'রে আয়না ?
মোটেও গোঁফ হয় নি চুরি, কক্ষণো তা হয় না ।
রেগে আগুন তেলে বেগুন, তেড়ে বলেন তিনি,
"কারো কথার ধার ধারিনে, সব ব্যাটাকেই চিনি ।
"নোংরা ছাঁটা খ্যাংরা ঝাঁটা বিচ্ছিরি আর ময়লা,
এমন গোঁফ ত রাখ্‌ত জানি শ্যাম-বাবুদের গয়লা !
এ গোঁফ যদি আমার বলিস্ কর্‌ব তোদের জবাই"—
এই না ব'লে জরিমানা কল্লেন তিনি সবায় !

ভীষণ রেগে বিষম খেয়ে দিলেন লিখে খাতায়—
"কাউকে বেশী লাই দিতে নেই, সবাই চড়ে মাথায়।
আফিসের এই বাঁদরগুলো, মাথায় খালি গোবর,
গোঁফ জোড়া যে কোথায় গেল কেউ রাখে না খবর।
ইচ্ছে করে এই ব্যাটাদের গোঁফ ধ'রে খুব নাচি,
মুখ্যুগুলোর মুণ্ডু ধ'রে কোদাল দিয়ে চাঁচি।
গোঁফকে বলে তোমার আমার—গোঁফ কি কারো কেনা ?
গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।"

—সুকুমার রায়

সৎপাত্র

শুনতে পেলুম পোস্তা গিয়ে—
তোমার নাকি মেয়ের বিয়ে ?
গঙ্গারামকে পাত্র পেলে ?
জানতে চাও সে কেমন ছেলে ?—
মন্দ নয়, সে পাত্র ভাল,
রঙ্ যদিও বেজায় কালো ;
তার উপরে মুখের গঠন
অনেকটা ঠিক প্যাঁচার মতন।
বিদ্যে বুদ্ধি ? বলছি মশাই—
ধন্যি ছেলের অধ্যবসায় !
উনিশটি বার ম্যাট্রিকে সে
ঘায়েল হ'য়ে থামল শেষে।
বিষয়-আশয় ?   গরীব বেজায়—
কষ্টে-সৃষ্টে দিন চ'লে যায়।
মানুষ ত নয় ভাইগুলো তার—
একটা পাগল একটা গোঁয়ার ;
আরেকটি সে তৈরী ছেলে,
জাল ক'রে নোট্ গেছেন জেলে।
কনিষ্ঠটি তবলা বাজায়
যাত্রাদলে পাঁচ টাকা পায়।

গঙ্গারাম তো কেবল ভোগে
পিলের জ্বর আর পাণ্ডু রোগে।
কিন্তু তারা উচ্চ ঘর,
কংসরাজের বংশধর!
শ্যাম লাহিড়ী বনগ্রামের—
কি যেন হয় গঙ্গারামের।—
যাহোক্, এবার পাত্র পেলে,
এমন কি আর মন্দ ছেলে?

—সুকুমার রায়

বাঁদীর সত্যসাধন

প্রবল প্রতাপ নাদিরশাহা সে
ভারত ভাসায়ে রক্তে,
নাস্তিক মত করেন প্রচার
বসি' দিল্লীর তক্তে।

আমিই মালিক দীন দুনিয়ার
যদি কেহ কহে, "খোদা আছে তা'র
গর্দান নেবে"— হুকুম প্রচার
হ'ল যত অনুরক্তে।

বেগম-মহালে বাদ্শা দুহিতা
কালো কেশরাশি এলায়ে,
চিকন-গাঁথনে গাঁথিছেন কভু
দিতেছেন কভু ফেলায়ে।
সহসা কনক-দর্পণখানি
ভূমে প'ড়ে গেল
কেমনে না জানি—
বাঁদী ছিল পাশে, "আল্লা" বলিয়া
কম-তনুখান হেলায়ে
বাদ্শাজাদীরে হাতে তুলে দিল
বাঁধা কেশরাশি এলায়ে।—

কহিলা কুমারী, "কি বলিলি বাঁদী—
স্মরিলি কি মোর পিতারে ?"
কিঙ্করী কহে সস্মিতাননে
আলোড়িত কেশ বিথারে—
"মিছা বলিব না, শাসনের বশে,
সোভান্ আল্লা অদ্বিতীয় সে
চিরস্মরণীয় সেই এক জন।"

রোষে বাঁকাইয়া সীঁথারে,
কুমারী কহিল, "কি বলিলি বাঁদি,
ডাকিস্ নি মোর পিতারে ?"
"মন নহে বাঁদী বাদ্‌শাজাদি,
এ বাঁদী ডরে না মরণে,
ত্যজিব এ তনু সত্য কহিয়ে,
সত্য পিতার স্মরণে।"

ঘাতকে ডাকিয়া ডাকিনীর প্রায়
কুমারী অম্‌নি বধিল তাহায়
সাধুজনে কহে, "যে চিনেছে তাঁয়
আজিকে মৃত্যু বরণে,
সে গেল চলিয়া দীন্ দুনিয়ার
সেই মালিকের চরণে।"

—শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী

মোগল প্রহরী

হল্‌দিঘাটের রণে—
রাণা রঘুপতি হেরে গেল যবে
মোগল-সেনার সনে ;
ধরা দিল না সে শত্রুর হাতে,
সঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে তার সাথে
পলাইয়া গেল আরাবল্লীর
গভীর গহন বনে।

শাহন্‌শাহ্‌ আকবর—
সংবাদ পেয়ে হুকুম দিলেন
মোগল-সেনার 'পর—
"যেরূপেই হোক্ রাণারে ধরিয়া
দাও মোর কাছে হাজির করিয়া.
কড়া পাহারায় রাখ ঘিরে তার
পথ-ঘাট-প্রান্তর !"

পশ্চাতে পুরোভাগে
রাণার গৃহের চারিপাশে তাই—
মোগল-প্রহরী জাগে।
কবে কোন্‌ পথে গোপনে গোপনে
রাণা আসে তার আপন ভবনে,

সেই ভরসায় ব'সে আছে সবে
উৎসাহ-অনুরাগে।

সহসা সে একদিন—
সন্ধ্যা নামিছে ধরণীর তীরে,
আকাশ সুরঙ্গীন ;
এমন সময় রাণা রঘুপতি
কোথা হ'তে ছুটে এল দ্রুতগতি,—
নম্র-নীরবে রাজ-প্রহরীর
হইল সম্মুখীন।

কহিল সে ধীরে ধীরে—
"ধরা দিনু আজি তোমার হস্তে
স্বেচ্ছায় নত-শিরে ;
শুধু রাখ মোর একটি মিনতি—
গৃহে যেতে আজি দাও অনুমতি,
মৃত্যু-কাতর পুত্রেরে দেখি'
আবার আসিব ফিরে।"

রাজ-প্রহরীর মন
আজি যেন কোন্ স্নেহ-করুণায়
গ'লে গেল অকারণ ;

সন্তান তরে পিতার পরাণে
কি যে ব্যাকুলতা—জানে সে-ও জানে ;
অনুমতি দিল তাই সে রাণারে
করিবারে পলায়ন।

হ'য়ে গেল জানাজানি—
বাদশার কানে পৌঁছিল এসে
নিদারুণ সেই বাণী।
ক্রুদ্ধ বাদশা অম্নি তখনি
হুকুম দিলেন কিছু নাহি গণি'—
"বন্দী করিয়া রাজ প্রহরীর
ফাঁসি দাও হেথা আনি।"

বন্দী-প্রহরী, হায় !
বধ্য ভূমিতে আনীত হইল
শৃঙ্খল-পরা পায়।
তখন আকাশে তরুণ তপন
উজল করেছে বিশ্ব-ভুবন
স্তব্ধ-নীরব গগন-পবন
প্রশান্ত মহিমায়।

নির্জ্জন চারিধার
ফাঁসির মঞ্চে উঠিল প্রহরী
নীরব—নির্ব্বিকার !
এমন সময় সহসা কে আসি'
কহিল—"থামাও, দিয়ো নাকো ফাঁসি,
প্রহরী নহেক—আমি নিজে দোষী,
ফাঁসি হবে—সে আমার ।"

সবার দৃষ্টি-গতি—
সহসা তখন ফিরিয়া আসিল
আগন্তুকের প্রতি ।
ব্যাকুল আবেগে কহিল সবাই—
"কে তুমি ? তোমার পরিচয় চাই !"
উত্তরে তার কহিল অতিথি—
"আমি রাণা রঘুপতি ।"

বিস্মিত আজি সবে,
ক্রন্দন-রোল ডুবে গেল আজি
আনন্দ-কলরবে !
ফাঁসির হুকুম রদ করি' দিয়া
বন্দী যুগলে এক সাথে নিয়া

গেল কোতোয়াল বাদ্‌শার কাছে
অজানা কি গৌরবে !
মহামতি আকবর
শুনি' সে কাহিনী পুলকিত অতি—
বিস্মিত অন্তর !
দু'জনেই আজি মহিমার বেশে
দেখা দিল তাঁর আঁখিকোণে এসে,
দু'জনেই আজি মহান্—উদার—
অপূর্ব্ব সুন্দর !
সব কথা গেল থামি'—
সিংহাসনের আসন হইতে
বাদ্‌শা এলেন নামি'।
কহিলেন তিনি বন্দী-যুগলে—
"প্রস্তুত হও, এই সভাতলে
সত্যই আজি তোমাদের গলে
ফাঁস পরাইব আমি।"
—বলিতে বলিতে তাঁর
কণ্ঠ হইতে নিলেন খুলিয়া
দুইটি মুক্তা-হার ;

পরায়ে সে হার গলে দু'জনার—
কহিলেন—"ধর দণ্ড আমার,
মুক্তির সাথে দিলাম আজি এ
মুক্তার উপহার !"

—গোলাম মোস্তফা

সর্ব্বনাশ

"পট্‌লা কোথায়,—পট্‌লা কোথায়" কর্ত্তা বলেন হেঁকে,

রান্নাঘরের থেকে

গিন্নী বলেন,—"পট্‌লা ছোঁড়া হতচ্ছাড়া, পাজি,

তাইতে তারে আজি—

শাস্তি দিয়ে বন্ধ ক'রে রেখেছি ঐ কোণের ছোট ঘরে,

সকাল বেলা পড়ায় হেলা ক'রে

ছাদের ওপর ওড়াচ্ছিল ঘুড়ি,

দুষ্টু তাহার জুড়ি

নাইকো ত্রি-ভুবনে—

বারে বারে মানা করি,—বাঁদর কি তা শোনে!

তাইতে আমি রেগে

দৌড়ে গিয়ে বেগে

কোণের ঘরে বন্ধ ক'রে তারে

দিলাম কঠোর শাস্তি একেবারে।

কান্নাকাটী কর্‌ছে নাকো ছোঁড়া,—

দুরন্ত মুখ-পোড়া;

এখন কত সাধাসাধি কর্‌ছি গিয়ে আবার

নিয়ে ভাল খাবার,

কিছুতেই সে বার হবে না—ভিতর থেকে এঁটে দেছে খিল্,

বেজায় যে মুশ্‌কিল্!—

ইস্কুলেতে যাবে না সে,
খাবে না সে,—
কর্‌বে না সে স্নান,
ঘর থেকে সে বার হবে না—হায় রে ভগবান!
শাস্তি তারে দিতে গিয়ে শাস্তি পেলাম নিজে,
ব্যাপারখানা কি যে
বুঝে ওঠাই ভার।
পট্‌লা ছোঁড়া কি জেদী আর কি কাষ্ঠ-গোঁয়ার!”
শুনে কথা কর্ত্তা মশাই—চক্ষু দু’টী করেন ছানা-বড়া,
বলেন,—ওগো, যাও গো ছুটে ত্বরা—
সব যে হোলো মাটি
দৌড়ে গিয়ে ছোঁড়ার মাথায় লাগাও ক’সে চাঁটি;
যেমন ক’রেই পার তারে বাইরে কর বার,
উপায় নাহি আর।
ছেলে বেলার বন্ধু ক’জন আস্‌বে আমার ঘরে,
অনেক দিনের পরে,—
তাইতে ভাল খাবার এনে বাগ-বাজারের থেকে
কোণের ঘরে রেখেছিলাম ঢেকে,—
বলা তোমায় হয়নি সময়-মত,
ব্যস্ত ছিলাম কত!

এতক্ষণে হয়তো ভেড়ের ভেড়ে
সাবাড় ক'রে সব ফেলেছে সেরে—
বত্রিশটা রসগোল্লা,—পাক্কা দু'সের টাট্কা মিহিদানা,
তাইতো এখন শক্ত বেজায় ঘরের থেকে বাইরে তাকে আনা!
এত টাকার খাবার
এতক্ষণে পেটুক-ছোঁড়া সব ক'রেছে সাবাড়।"

—শ্রীসুনির্ম্মল বসু

দুলাল পালের ছেলে ভুলাল

দুলাল পালের ছেলে ভুলাল সব কাজে তার ভুলটি,—
কাল্‌না যেতে টিকিট কিনে হাজির হলো কুল্‌টি।
মাসীর বাড়ী যেতে গয়ায় কাশীর পানে ছুট্‌ল,
মামার বাড়ী গিয়ে ভুলে চামার বাড়ী উঠলো।
বই বগলে এই তো সেদিন যাচ্ছিল সে ইস্‌কুল,
হারাধনের গোয়াল-ঘরে পৌঁছে গেল বিল্‌কুল।
মাঠের থেকে আন্‌তে গরু ভুলাল গেল দৌড়ে,—
গলায় দড়ি বেঁধে আনে শ্যাম-গয়লার বৌ'রে।
রাতের বেলায় চোর ভেবে সে আচ্ছা ক'রে পাক্‌ড়ে,
অন্ধকারে ছায় ফাটিয়ে ঠাকুরদাদার টাক্‌ রে।
দুলাল বলে,—পুকুর থেকে মৎস্য ধরে আন্‌তো ;
ভুলাল আনে মনের ভুলে কেউটে ধ'রে জ্যান্ত।
তামাক সেজে আন্‌তে ভুলে—সপ্তাহেতে চারদিন,
মনের ভুলে হুঁকোর খোলে আন্‌বে ঢেলে তাপিণ।
কুটুম এলো,—দুলাল হেঁকে বল্লে তাদের সাম্‌নে,—
"ছাগল কিনে আন্‌তো ভুলাল, তিন্‌টি টাকা দাম নে।"
ভুলাল গেল বাজার-মুখো,—কুটুম ব'সে থাক্‌ রে—
সন্ধ্যা-বেলা আন্‌লে ভুলাল কুকুর ছানা পাক্‌ড়ে।
খাবার সময় ঘুমায় ভুলাল, ব্যস্ত সবাই তাইতে ;
ঘুমের বেলা মনের ভুলে ভুলাল চলে নাইতে।

গ্রীষ্মকালে লেপ-কম্বল জড়িয়ে রাখে গাত্রে ;
ঠাণ্ডা জলে সাঁতার কাটে শীতের দিনে রাত্রে।
মনের ভুলে ঘরের চালে ভুলাল লাগায় অগ্নি,
বেড়াল ভেবে বোন্‌কে ঠ্যাঙায়, চ্যাঁচায় ব'সে ভগ্নী।
ক্ষীরের সাথে নুন মেখে খায়, মাছের ঝোলে মিষ্টি,
পিঠের সাথে লঙ্কা মাখে,—নাই কিছুতেই দৃষ্টি।
সবাই বলে কঠিন ব্যামো, কেমন ক'রে সারবে ?
বৈদ্য হাকিম হদ্দ হলো ; ওঝায় কত ঝাড়্‌বে !
সেদিন ভারি মজার ব্যাপার, দৈ ভেবে সে রাত্রে,—
চূণের ভাঁড়ে চুমুক দিল অন্ধকারে হাত্‌ড়ে।—
বাপ্‌রে সে কি রাম জ্বলুনী ; উঃ কি ভীষণ তেষ্টা,
কেরোসিনের তেল নিয়ে সে ফেল্লে গিলে শেষটা।
রাম-ছাগলের নাচ দেখেছো ? ম্যাড়ায় নাচে যেম্‌নি—
হাত পা তুলে তিড়িং তিড়িং নাচলো ভুলাল তেমনি !
সেদিন থেকে ধরলো ওষুধ, ব্যাপার হলো উল্টা,—
ভুলাল পালের রোগ সেরেছে, ভাঙ্‌ল মনের ভুলটা।

—শ্রীসুনির্ম্মল বসু

গৌতমের গৃহত্যাগ

স্তব্ধ আষাঢ় পূর্ণিমা রাত নিথর নিঝুম—কর্‌ছে সাঁ সাঁ!
কোন্ অতলে তলিয়ে গেছে ধরার ধ্বনি, ধরার ভাষা!
শান্তি নিবিড়, শান্তি অটল, শান্তি কঠোর মৃত্যু যেন!
কেবল ঝিঁঝির ডাক শোনা যায় বিশ্ব-প্রাণের রণন হেন!
চাঁদের আলোয় নিদ্রা ঝরে, নিদ্রা-নিবিড় জ্যোৎস্না-রাতি!
শুদ্ধোদনের রাজপ্রাসাদে জ্বল্‌ছে নাকো একটি বাতি।
স্তব্ধ পুরী,—হাস্যধ্বনি, বন্দনা-গান, নৃত্য, কথা,
মন্ত্রণালাপ, শঙ্খ আরাব, নর্ত্তকীদের উচ্ছলতা,
আরতি-সাম,—সকল নীরব, সব ডুবেছে কোন্ গভীরে!
ঘরে ঘরে সুপ্ত জনের জাগ্‌ছে আরাম—নিশাস ধীরে!
ধরার বুকে নেইক ধ্বনি, রাজপ্রাসাদে নেইক সাড়া!—
শয্যা 'পরে কে ঐ নড়ে, কে ঐ নড়ে নিদ্রাহারা!
অগাধ ঘুমায় যশোধরা, বক্ষে ঘুমায় ছোট্ট ছেলে,
তারই পাশে গৌতম ও যে নিদ্রাবিহীন চোখটি মেলে'।
কি ব্যথা তার বাজ্‌ছে বুকে? কিসের দুখে রাত্রি জাগে?
কি ভাবনায় ক্ষিপ্ত ও মন? নিদ্রা কেনই তুচ্ছ লাগে?—
দুখের ব্যথা, শোকের ব্যথা, দৈন্য-ব্যথা, জরার ব্যথা
ঐ বুকে তার ভিড় করেছে সব বেদন ও কাতরতা।
বক্ষে যেন বাণ লেগেছে ছট্‌ফটিয়ে উঠ্‌ছে পাখী!
নিদ্রা নাহি নিদ্রা নাহি, ব্যাকুল যুবক থাকি' থাকি'।

উঠ্‌ল যুবা, প্রাণ যে জ্বলে, বস্‌ল উদাস শয্যা 'পরে,
গুপ্ত বেদন আজকে ভীষণ ব্যাকুল করে চেতন করে।
জান্‌লা দিয়ে দেখ্‌ল যুবা আকাশ-গায়ে জ্বল্‌ছে তারা,—
অসীম দেশের আভাস দিয়ে ভাঙ্‌তে কি রে বল্‌ছে কারা?
ঝড় উঠেছে, ঝড় উঠেছে, ধরার সাগর দুল্‌ছে ঝড়ে,
মানুষ-তরী ডোবে ডোবে,—রাখ্‌বে কে তায় হালটি ধ'রে?
বেদন-নত ভূতলশায়ী লক্ষ জনার ক্ষুব্ধ কানে
মুক্তি-অভয় কে দেবে রে?—উঠ্‌বে সবাই সবল প্রাণে।
বাজে বাজে বিষম বাজে—বক্ষে ব্যথায় ডাঙশ হানে;
দাঁড়ায় যুবা শয্যা পাশে, উদাস হেরে আকাশ পানে।
এই তো রাতি, এই অবসর, তারায় চাঁদে বল্‌ছে মোরে—
বেরিয়ে পড়ো, বেরিয়ে পড়ো, আর কি সুযোগ পাবি ওরে?
হয় মিশে থাক্ মিথ্যা মায়ায়, প্রিয়ার প্রেমে থাক্‌রে মিশি';
নয় চ'লে আয় জগৎ-বুকে, এই ত সুযোগ—নীরব নিশি।
হেথায় মুকুট, স্বর্ণ-আসন—হোথায় ধূলি কাঁকর-ভরা;
হেথায় বিলাস, নর্ত্তকী-গান—হোথায় রোদে পুড়্‌ছে ধরা;
হেথায় স্নেহ-শীতল গেহ—হোথায় মানুষ জ্বল্‌ছে তাপে;
হেথায় সেবা ব্যগ্র অশেষ—হোথায় দুখে দল্‌ছে দাপে;—
কোন্‌টা নিবি কোন্‌টা নিবি? তারায় তারায় যে জিজ্ঞাসে—
হ'বি রাজা না ভিখারী? দাঁড়াব ভাই সবার পাশে।

দুর্ব্বলেরি বক্ষ দ'লে ঘুর্‌বে না মোর রথের চাকা,
শোণিত-আশী-রাজ-তরবার এই পুরেতেই থাকুক ঢাকা।
দুর্ব্বলেরে বল দেবো রে, দুখীর হবো সুখের কামী,
মুছিয়ে শোণিত দানব অভয় আমি আমি এই এ আমি।
রাজ-আভরণ নয়ক আমার, ছেঁড়া কাপড় অঙ্গ-ভূষণ ;
শয্যা কোমল বিঁধ্‌ছে গায়ে, ধরার ধূলি আমার শয়ন ;
রাজপ্রাসাদের শীতল ছায়ায় আমার নিবাস নয় রে নহে ;
পথের পাশে, রোদের তাপে, গাছের তলায় নিবাস রহে।
রাজার শাসন, বিধির শাসন, পুরোহিতের শাসন যত—
মুছ্‌ব আমি সকল শাসন, মুছ্‌ব আমি সকল ক্ষত।
ঐ আসে রে ঐ আসে রে, ঐ যে শুনি কাতর ধ্বনি,—
পুত্রহারা কাঁদ্‌ছে শোকে হারিয়ে তাহার বুকের মণি !

মৌন দাঁড়ায় ক্ষুব্ধ যুবা, জায়ায় হেরে পুত্রে হেরে,—
যায় বড় সাধ আঁকড়ে ধরে দুইটি জনে বাহুর বেড়ে।
হাত সে বাড়ায়, আবার গুটায়,—না, না, একি আবার মায়া?
হেথায় দুটি, হোথায় কোটি মানব যে রে দগ্ধকায়া ;
যাই চ'লে যাই, যাই চ'লে যাই, যাচ্ছি আমি শোনো, শোনো,
দুঃখী ওগো, ব্যথিত ওগো, আর ভাবনা নাইক কোনো।

পাওনি প্রীতি ? পাওনি দয়া ? আমি সবায় প্রেম বিলাব,
প্রেমের আলোয় প্রেমের সুধায় দুখ মুছাব, শোক তাড়াব।
রাজার ছেলে রাজ্য নিয়ে শাস্‌ব সবায় ঘুরিয়ে আঁখি—
এই কি রে সুখ !—হায় অভাগা !—প্রেম দিয়ে যে রাখ্‌ব ঢাকি'
ব্যথায় দেবো দরদ-মধু, বিপথ হ'তে আন্‌ব পথে,
মুক্তিবাণী শুনিয়ে দেবো,—বাঁচ্‌বে মানুষ শঙ্কা হ'তে।
সুপ্ত থাকো, তৃপ্ত থাকো, যশোধরা, আমার প্রিয়া,
কিন্‌লে তুমি এই যে হিয়া, সবার হ'তে দাও এ হিয়া।
দ্বার খুলে' যায় বেরিয়ে যুবা, বিপুল নিশা হাওয়ার ভরে
ডাক্‌ল যেন। দাঁড়ায় যুবা। আবার সে যে ফির্‌ল ঘরে।
ঐ না নড়ে যশোধরা !—ঐ যে শিশু, আহা !—আহা !
ছাড়্‌ব এদের ? চির জনম ? কেমন ক'রে সইব তাহা ?
কক্ষে ঘোরে আবার যুবা, লাগ্‌ল গায়ে নিশার হাওয়া,
ডাক্‌ল পেচক প্রাসাদ-শিরে, রাত বুঝি নেই ? হয় না যাওয়া !
ছাদের 'পরে বেরিয়ে যুবা হের্‌ল আকাশ—নেইক সীমা ;
মৌনা নিশীথিনীর বুকে শব্দ নাহি—অচল ভীমা !
যুক্ত করে দাঁড়ায় যুবা যশোধরার চরণ-মূলে,
শেষ দেখা সে দেখ্‌ল প্রিয়ায়, দেখ্‌ল ছেলেয় দেখ্‌ল ভুলে' !
যশোধরার শয্যা ঘিরে' ঘুর্‌ল সে ধীর তিনটি বারে।—
কেঁদো নাকো, ফির্‌ব আমি সবায় নিয়ে তোমার দ্বারে।

যাই প্রিয়া যাই, যাই প্রিয়া যাই, বিদায় বিদায়, আসি আসি,
তোমায় আমি ভালোবাসি, জগৎ-জনে ভালোবাসি !

ঘর হ'তে সে বেরিয়ে এল, চাইল আবার আকাশ পানে ;
জগৎ তারে ডাক দিয়েছে ব্যথার টানে প্রেমের টানে।

—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ

জষ্টিমাসের সাতটা বেলা, চড়্‌চড়ে রোদ খুব,
সাত বন্ধুর ফন্দী হ'ল পাঠশালে দিই ডুব।
চণ্ডে কুমোর, তার সদরের পাশেই শেঁকুল-বন,
তার ঝোপেতে কাটিয়ে সকাল বের হ'ল সাত জন।
বল্‌লে যতীন—"সবাই মিলে যাত্রা করি আয়,
"দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ—তাক্ লেগে সব যায়!"
ঝোড়ো সাজ্‌বে দুর্য্যোধন আর যতীন হবে ভীম,
মনসা হবে কৃষ্ণ, নইলে কর্‌বে যে টিম্‌টিম্‌।
নকুল হবে মট্‌রা আর চণ্ডে সহদেব,
অর্জ্জুন হবে বনমালী, মানিয়ে যাবে স্রেফ্‌।
বাঁশের ডগায় জড়িয়ে কাপড় হ'ল গদা দুই;
বাখারিতে হয় তলোয়ার ভেঙে মাচার পুঁই।
তালপাতারি মুকুট হ'ল, 'সাজ্‌ সাজ্‌ সাজ্‌' রব,—
নকুড়, মানি, রেমো, অতুল দেখ্‌তে আসে সব।
ঝোড়োদের এক মাঝদালানে যাত্রা লাগে ঘোর,
গোয়াল-ঘরে 'সাজ-ঘর' হ'ল, টিন্‌ বাজ্‌ছে জোর—
দুম্‌ দুমা দুম্‌, দুম্‌ দুমা দুম্‌,—কৃষ্ণ আসেন ওই,
বলেন জোরে—"এই তো রে হ্রদ, দুর্য্যোধন সে কই?"
বেরিয়ে এসে দুর্য্যোধন সে করে নমস্কার;
কৃষ্ণ বলেন—"বৎস, এস, দেখা পাওয়া যে ভার!

পাঁচ পাণ্ডব খুঁজ্‌ছে তোমায়, ওই আসে এই দিক্‌,
কর্‌বে যা আজ সবাই মিলে ক'রেই ফেল ঠিক।"

ঢুকেই চেঁচান ভীম মহাশয়—"আরে আরে কে,
পাষণ্ড কুষ্মাণ্ড বটে দুর্য্যোধনটা যে!
কোথায় পামর লুকিয়েছিলি, কোথায় কুলাঙ্গার?
আয় চ'লে আয়, গদার ঘায়ে এস্পার ওস্পার।"
চোখ পাকিয়ে দুর্য্যোধন সে বল্‌ছে—"থাম্‌ থাম্‌,
ঢের বকেছিস্‌ মাম্‌দো গোভূত পোঁটাচুন্নী রাম!
এই গদাতে সাব্‌ড়ে দিছি তোর মত ঢের লোক,
ভাবিস্‌নিকো বাঁচ্‌বি এবার, উল্‌টে দেবো চোক্‌।"
গর্জ্জাল ভীম—"কি বল্‌লি! বড়ই অহঙ্কার!
জানিস্‌নিকো এই গদাতে হাজার হাজার
ঘাল করেছি কুরুক্ষেত্রে, আজ্‌কে দেখাস্‌ দাঁত।
কর্‌ব গুঁড়ো, ফাঁসিয়ে ভুঁড়ি কর্‌ব কুপোকাৎ।"
"আরে-রে আরে-রে পামর"—গর্জ্জে দুর্য্যোধন,
"লাগ্‌ লাগ্‌ লাগ্‌, আয় তবে আয়, কর্‌ব আজি রণ।"
পাঁই পাঁই পাঁই ঘুরিয়ে গদা ভীম দিল এক লাফ্‌,
বল্‌লে সবায়—"সাক্ষী থেকো, বাজাও তবে ঢাক।

আয় চ'লে আয়, রে দুর্য্যোধন, দেখ্‌ব কেমন জোর,
দাঁত ভাঙে আজ কে কার, তোকে পাঠাই যমের দোর।"
জান্‌লার ওপর উঠে কেষ্ট ভীমকে বলেন—"ছাখ্,
ঠিক উরুতে মারবি জোরে—এইটি মনে রাখ্।"

তার পরেতে ঘুর্‌ল গদা পোঁ পোঁ বন্ বন্,
ভীম যে লাফায়, দুর্য্যোধনও ঘুর্‌ছে পনর্ পন্।
"আয় চ'লে আয়, আয় চ'লে আয়," আবার বলে ভীম;
দুর্য্যোধনও বলে, "আয় না, কর্‌বি ঘোড়ার ডিম্!"
বল্‌তে বল্‌তে গদায় গদায় লাগ্‌ল ঠকাস্ ঠক্,
ফোঁস করে কেউ, ঘোঁৎ করে কেউ, কেউ করে বক্ বক্।
দুই জনেরি রোখ্ চেপেছে, রক্ষে নাহি আর,
এ ওর কাঁধে বসায় গদা, বিষম আওয়াজ তার।
ধপাস্ ধপাস্ দুইজনাতে লাগ্‌ল যেন মোষ—
কোমর থেকে কাপড় খোলে, ভীম বলে—"রোস্ রোস্।"
দুর্য্যোধনের উরুর ওপর ধপাস্ ধপাস্ ধপ্
যতই জোরে লাগাচ্ছে ভীম, সেও মারে খপ্ খপ্।
দুর্য্যোধনের মর্‌তে তখন ইচ্ছে মোটেই নেই,
ভীমকে লাগায় ধপাস্ ধপাস্ জিত্‌বে যেন সে-ই।

দুর্য্যোধনকে কেষ্ট বলে—"যা প'ড়ে যা, মর্" ;
সে বলে—"তুই থাম্ থাম্ থাম্, ভীমকে দেখি সর্।"
এই না ব'লে লাগ্‌ল আবার তাথৈ তাথৈ রণ,
গদার তখন কাপড় খুলে বাঁশ বেরোয় একদম।
সেই বাঁশেতে ভীমের ঘাড়ে মারে দুর্য্যোধন,—
একটি ঘায়ে হুম্‌ড়ে পড়ে ভীম যে বাছাধন!
"ও বাবা গো, ফেল্‌লে মেরে, ভেঙে দিয়েছে কাঁধ্,"
গড়িয়ে ধূলোয় ভীম কাঁদ্‌ছেন—"জল দিয়ে কাঁধ্ বাঁধ্।"
এই না দেখে দুর্য্যোধন তো ভয়েই দিল রড়,
রেমো, চণ্ডে চেঁচিয়ে বলে—"ধর্ ঝোড়োকে ধর্।"
ঝোড়ো তখন পালিয়ে লুকোয় ঘোষাল-পুকুর-পাড় ;
ভীম পালোয়ান যতীন কাঁদে, তার ভেঙেছে হাড়।
দুর্য্যোধনের ভাঙ্‌তে উরু ভীম যে কুপোকাৎ,
বেঁচে রইল দুর্য্যোধন আর ভীম খাবে ঝোল-ভাত !!

—শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

উদ্বোধন

ওঠো নারি ! বিশ্বরমা, অন্ধ-সিন্ধুতল তেয়াগিয়া
কল্যাণীর বেশে,
নয়নে অমৃত-উৎস, কক্ষে সুধাভাণ্ড ভরি' নিয়া
এসো স্নিগ্ধ হেসে।
আজি যে নিখিল-নর তপ্ত মরুজ্বালা বহি' প্রাণে,
আকণ্ঠ পিপাসা ল'য়ে সকাতরে তোমারে আহ্বানে,
হে কল্যাণি, প্রাণ-পাত্র ভরো ভরো প্রেমসুধা দানে
তৃপ্ত করো তৃষা,—
জীবনে নির্ম্মল উষা ফুটুক তোমার দিব্যগানে
টুটি' অন্ধ-নিশা।

এসো সুমঙ্গলারূপে সমুজ্জ্বল সিন্দুরের টীকা
আঁকি নম্র-ভালে
অন্ধকার গৃহপ্রান্তে জ্বালাও মঙ্গলদীপ-শিখা
নিত্য সন্ধ্যাকালে।
ঘনস্নেহে আমন্থর স্নিগ্ধ তব হৃদয়-সমীর
জুড়াইয়া দিক্ আজি নিখিলের দাহতপ্ত-শির ;
নরের ক্রন্দন
নিমেষে হউক স্তব্ধ ! তব চিত্ত অমরাবতীর
লভি' নিমন্ত্রণ।

জাগো জাগো হে সাবিত্রি, বাঁচাও স্বল্পায়ু স্বামী তব,
সমাগত যম !
নয়নে নামিছে তার মরণের আঁধার নীরব
স্তিমিত নির্ম্মম !
প্রদীপ্ত সতীত্বতেজে ওগো দৃপ্তা ! মৃত্যুরে জিনিয়া
শমনের পাশ হ'তে আনো আনো প্রিয়রে ছিনিয়া,
হে নারি সবিতৃকন্যা ! জেগে ওঠো আপনা চিনিয়া
বিশ্বে সব খানে।
সঞ্জীবিত করো দেবি অটুট অন্তর-শক্তি নিয়া
মৃত-সত্যবানে।

স্বেচ্ছায় ভিক্ষুর কণ্ঠে রাজপুত্রী বরমাল্য দিবে
ত্যজি' রত্ন-হেমে,—
হে দক্ষদুহিতা, আজি সন্ন্যাসী শ্মশানচারী শিবে
লহ বরি' প্রেমে।
সকল গঞ্জনা গ্লানি তুচ্ছ করি' বাধাবিঘ্ন শত
নির্ব্বাচিয়া লহ পতি, হে অর্পণা ! নিজ মনোমত ;
তেজস্বিনি অয়ি !
দশ-মহাবিদ্যারূপে মহেশে চরণে করো নত,
দৃপ্ত-শক্তিময়ি !

সত্য শিব-সুন্দরের অপমান ঘটে বিশ্বে আজ
—এসো এসো সতি !
ত্রিনেত্রে প্রদীপ্ত-বহ্নি হস্তে শূল, ভৈরবীর সাজ
এসো ভগবতি !
অশিবের অন্যায়ের অসত্যের প্রতিবাদ তরে
জীবন উৎসর্গি' দাও শিবহীন-যজ্ঞ পণ্ড ক'রে
আত্মভোলা আশুতোষ যেন মহারুদ্ররূপ ধ'রে
মথি' মিথ্যা-যাগ,—
অভিজাত-দম্ভ দমি' ভূতনাথ আহরে স্বকরে
যজ্ঞ প্রাপ্যভাগ।

হস্তিনার সভাতলে পৃষ্ঠে ল'য়ে মুক্ত-মেঘবেণী—
সরোষ নিঃশ্বাসে
ভীষণ প্রতিজ্ঞা পুনঃ নির্ঘোষি উচ্চার' যাজ্ঞসেনী
জ্বলন্ত-বিশ্বাসে।
নারীত্বের অপমান ঘটাল যে-নীচ দুরাচার
তার তপ্ত রক্তরাগে বিরচিবে বেণী পুনর্ব্বার,
পশুরে সংহারি'
কুরুক্লিষ্ট আর্য্যাবর্ত্তে আন গর্ব্ব বীর-দয়িতার
হে পাণ্ডব-নারি !

নিখিল-নরের চিত্তে অপূর্ণতা যাহা কিছু আছে—

ক্ষোভ মনে মনে ;

হে নারি, তোমারি দ্বারে পূর্ণতার তৃপ্তি তারা যাচে

বিশ্ব-আবর্ত্তনে।

শুধু কন্যা, মাতা, ভগ্নী, শিষ্যা, দাসী, সখী তুমি নহ,

আরো কিছু—আরো কিছু—ধ্বনি ওঠে বিশ্বে তৃষাবহ,

পূর্ণ মনুষ্যত্বে জাগি' নিখিলের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রহ

সঞ্চারিয়া প্রাণ ;

আনন্দ জীবন রস কর্ম্ম জ্ঞান বিশ্বে বহি লহ

বিধাতার দান।

—শ্রীরাধারাণী দেবী

ছবি আঁকা

দাদা গেছে ইস্কুলে বাবা গেছে আপিসে
খুকিটা ঘুমোয় শুয়ে মার পাশে বালিসে।
বাবার টেবিলে আছে লাল নীল পেন্‌সিল,
রংচঙে বই আর মোটা খাতা লাল নীল।
তাড়াতাড়া চিঠি আছে আলপিন্ ষ্টীল পেন,
আরে আরে বাবা আজ ফেলে গেছে ফাউন্টেন্!
দেখি আজ আমারে কে আট্‌কায় এইবার,
মজা সে ছবিটা আঁকি মলাটে এই বইটার।
দাদা লেখে হিজিবিজি মোটা মোটা ফাঁক্ ফাঁক্,
আমি হাত দিলে পরে অমনিই 'রাখ্ রাখ্'।
কেন বাপু আজও আমি আছি কচি খোকাটি?
ভাবে যেন খুকিটার মত আছি বোকাটি!
বাবা বলে কম লেখো, দাদা বলে এ বি সি,
তার চেয়ে ছবি-আঁকা ভালো বলে ন' পিসি।
ক খ লেখা খুব সোজা, ছবি-আঁকা শক্ত
না বুঝে সবাই শুধু বকুনিতে ভক্ত।
এই দেখো কালি দিয়ে মানুষটা আঁকছি,
ঠিক যেন দেখাচ্ছে ওবাড়ীর বাগ্‌চি।
মলাটটা হ'য়ে গেল ভেতরটা ওল্‌টাই,
পাতাগুলো লেখা সব খালি নেই কোনোটাই।

এতগুলো সাদা পাতা মিছে সব নষ্ট,
হিজিবিজি লিখে সব কেন পায় কষ্ট ?
এই ধারে আঁকি, আরে—নিব্ করে মট্ মট্,
বলো দেখি কি এঁকেছি এ ছবিটা চট্ পট্ ?
হাতি ? তবে শুঁড় কই ?—কি বলছ ? ইঞ্জিন ?
চাকা কোথা গেল তবে ? তবে বুঝি দূরবীণ ?
দূর বোকা, এ যে খুকি চোখ্ করে পুট্ পুট্ ;
ওরে বাবা, দাদা ওই এল বুঝি—ছুট্ ছুট্ !

—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

গদ্য

আমার দুর্গোৎসব

সপ্তমী পূজার দিন কে আমাকে এত আফিং চড়াইতে বলিল! আমি কেন আফিং খাইলাম! আমি কেন প্রতিমা দেখিতে গেলাম! যাহা কখন দেখিব না তাহা কেন দেখিলাম! এ কুহক কে দেখাইল!

দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের স্রোত, দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে—আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখিলাম—অনন্ত, অকূল, অন্ধকারে, বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোত—মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে—আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—'মা! মা'! করিয়া ডাকিতেছি। আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা! কই মা আমার? কোথা কমলা-কান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল-জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা। জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা? হ্যাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃণ্ময়ী—এই মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্ন-ভূষিতা— এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশ দিক—দশ দিকে প্রসারিত;

তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত—পদাশ্রিত বীরজনকেশরী শত্রুনিষ্পীড়নে নিযুক্ত। এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না—কাল দেখিব না—কালস্রোতে পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভূজা, নানা-প্রহরণ-প্রহারিণী, শত্রুমর্দ্দিণী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ! আমি সেই কালস্রোতমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা!

কোথায় ফুল পাইলাম, বলিতে পারি না—কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম—ডাকিলাম,—"সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে, আমার সর্ব্বার্থসাধিকে! অসংখ্যসন্তানকুল-পালিকে! ধর্ম্ম-অর্থ-সুখ-দুঃখ-দায়িকে! আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর। এসো মা, গৃহে এসো—ছয় কোটি সন্তানে একত্র এককালে, দ্বাদশ কোটি কর জোড় করিয়া, তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটি মুখে ডাকিব, মা প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্যদায়িকে! নগাঙ্কশোভিনি নগেন্দ্রবালিকে। শরৎসুন্দরি চারু-পূর্ণচন্দ্রভালিকে! ডাকিব,—সিন্ধু-সেবিতে সিন্ধু-পূজিতে সিন্ধু-মথনকারিণি! শত্রুবধে দশভূজে দশপ্রহরণ-ধারিণি! অনন্তশ্রী অনন্তকালস্থায়িনি! তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা? এই ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব—

এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব, এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব—না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এস মা, গৃহে এসো,—যাঁহার ছয় কোটি সন্তান তাঁহার ভাবনা কি ?

দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—সেই অনন্ত কাল-সমুদ্রে সেই প্রতিমা ডুবিল! অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জল-রাশি ব্যাপিল ; জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পূরিল! তখন যুক্তকরে সজলনয়নে ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব, তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব,—অধর্ম্ম আলস্য ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা,—একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা! উঠ উঠ, উঠ মা বঙ্গজননি!

—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিনি পয়সার ভোজ

অক্ষয়—(হাসিতে হাসিতে) আজ আচ্ছা জব্দ করেছি। বাবু রোজ আমাদের স্কন্ধে বিনামাশুলে বিনামূল্যে ইয়ার্কি দিয়ে বেড়ান, আর লম্বা চওড়া কথা কন্! মশায়, আজ বছর খানেক ধরে রোজ বলে আজ খাওয়াবো, কাল খাওয়াবো,—খাওয়াবার নাম নেই! যতখানি আশা দিয়েচে তার সিকি পরিমাণ যদি আহার দিত তাহলে এতোদিনে তিনটে রাজসূয় যজ্ঞ হ'য়ে যেতে পারতো। যা হোক্ আজ তো বহু কষ্টে একটা নিমন্ত্রণ আদায় করা গেচে। কিন্তু দুটি ঘণ্টা বসে আছি, এখনো তার দেখা নেই! ফাঁকি দিলে না তো? (নেপথ্যে চাহিয়া) ওরে! কি নাম তোর, ভূতো, না মেধো, না হরে? চন্দ্রকান্ত? আচ্ছা বাবু তাই সই; তা ভালো চন্দ্রকান্ত, তোমার বাবু কখন আস্‌বে বল দেখি?

কী বল্লি? বাবু হোটেল থেকে খাবার কিনে আন্‌তে গেচেন? বলিস্ কি রে? আজ তবে তো রীতিমত খানা। ক্ষিদেটিও দিব্যি জমে এসেচে! মটনচপের হাড়গুলি একেবারে পালিশ ক'রে হাতির দাঁতের চুষিকাঠির মত চক্‌চকে ক'রে রেখে দেবো। একটা মুরগির কারি অবিশ্যি থাক্‌বে—কিন্তু কতোক্ষণই বা থাক্‌বে? আর দু রকমের দুটো পুডিং যদি দেয় তা হ'লে চেঁচেপুচে চীনের বাসনগুলোকে একেবারে কাঁচের আয়না বানিয়ে দেবো। যদি মনে ক'রে ডজন দু-তিন অয়েষ্টার-

প্যাটি আনে তা হ'লে ভোজনটি বেশ পরিপাটি রকমের হয়! আজ সকাল থেকে ডান্ চোখ নাচ্‌চে, বোধ হয় অয়ষ্টার প্যাটি আস্‌বে। ওহে চন্দ্রকান্ত! তোমার বাবু কখন গেচেন বলো দেখি?

অনেকক্ষণ গেচেন? তবে আর বিস্তর বিলম্ব নেই। কিন্তু সেই অবধি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে পা ব্যথা হ'য়ে গেল—আর তো পারিনে—এই মাটিতেই বসা যাক্!

(কোঁচা দিয়া ধূলা ঝাড়িয়া একটা খবরের কাগজ মাটিতে পাতিয়া উপবেশন ও গুন্ গুন্ স্বরে গান)

যদি জোটে রোজ
এম্‌নি বিনি পয়সার ভোজ!
ডিসের পরে ডিস্
(শুধু) মটন্ কারি ফিশ্!
যদি জোটে রোজ—

(তবে) থাকি মনের সুখে হাস্যমুখে কে কার রাখে খোঁজ!

কিন্তু বাবুর আস্‌বার জন্যে তো কোনো রকম তাড়া দেখ্‌চিনে! সে বোধ হয় প্যাটিগুলি একটি একটি ক'রে শেষ করচে! এদিকে আমার পেট এমনি জ্বলে উঠেচে যে, মনে হচ্চে যেন এখনি কোঁচায় আগুন ধ'রে যাবে! তৃষ্ণাও পেয়েচে।

ঐ বুঝি আস্‌চে! পায়ের শব্দ শুন্‌চি। আঃ বাঁচা গেল।

ওহে উদয়, ওহে উদয়! কই, না তো! তুমি কে হে?—

বাবু তোমাকে পাঠিয়ে দিলেন? তার চেয়ে নিজে এলেই তো ভালো করতেন! ক্ষিদেয় যে গেলুম!

হোটেলের বাবু! কই তাঁর সঙ্গে তো আমার কোনো আত্মীয়তা নেই। কিছু খাবার পাঠিয়েচেন বলতে পারো? অয়ষ্টার প্যাটিস্?

পাঠান নি? বিল্ পাঠিয়েচেন? কৃতার্থ করচেন আর কি! যে বাবুটির নামে বিল্ তিনি এখানে উপস্থিত নেই!

আরে না রে না! আমি না! এও তো ভালো বিপদে পড়লুম!—আরে মাইরি না! কী গেরো! তোমাকে ঠকিয়ে আমার লাভ কি বাপু? আমি নিমন্ত্রণ খেতে এসে তিন ঘণ্টা এখানে ব'সে আছি—তুমি হোটেল থেকে আসচো, তবু তোমাকে দেখেও অনেকটা তৃপ্তি হচ্চে! বোধ হয় তোমার ঐ চাদরখানা সিদ্ধ করলে ওর থেকে নিদেন—ভয় নেই, আমি তোমার চাদর নেবো না, কিন্তু বিলটিও চাইনে! তুমি নীচে গিয়ে একটু বোসো উদয় বাবু এখনি আস্‌বেন।

বিধাতা সকাল বেলায় এই জন্যেই কি আমার ডান চোখ নাচিয়েছিলে? হোটেল থেকে ডিনার না এসে বিল্ এসে উপস্থিত! হে বিধি, তোমারই বিচারে সমুদ্রমন্থনে একজন পেলে সুধা আর একজন পেলে বিষ, হোটেলমন্থনেও কি একজন

পাবে মজা আর একজন পাবে তার বিল্! বিল্টাও তো কমদিনের নয় দেখ্চি!

তুমি আবার কে হে? বাবু পাঠিয়ে দিলে? বাবুর যথেষ্ট অনুগ্রহ! কিন্তু তিনি কি মনে করেচেন যে তোমার মুখখানি দেখেই আমার ক্ষুধা দূর হবে? তোমার বাবু তো বড় ভদ্রলোক দেখ্চি হে!

উদয় বাবু কাপড় কিন্‌বেন আর অক্ষয় বাবু তার দাম দেবে। তোমারো তো বিবেচনা শক্তি বেশ দেখ্চি!

সত্যি না কি? কিসে ঠাওরালে যে আমারই নাম উদয় বাবু? কপালে কি সাইনবোর্ড টাঙিয়ে রেখেচি? আমার অক্ষয় বাবু নামটা তোমার পছন্দ হলো না?

নাম বদ্‌লেচি? আচ্ছা বাপু শরীরটি তো বদলানো সহজ ব্যাপার নয়! উদয়বাবুর সঙ্গে কোন্‌খানটায় মেলে বল দেখি?

উদয়বাবুকে কখনো চাক্ষুষ দেখো নি?—আচ্ছা একটু সবুর করো, তোমার মনের আক্ষেপ মিটিয়ে দেবো। বিস্তর দেরী হবে না, তিনি এলেন ব'লে!

আরে মোলো! এ আবার কে আসে? মশায়ের কোত্থেকে আসা হলো? মশায়েরও এখানে নিমন্ত্রণ আছে বুঝি?

বাড়িভাড়া? কোন্ বাড়ীর ভাড়া মশায়? এই বাড়ীর? ভাড়াটা কতো হিসেবে?

মাসে সতেরো টাকা? তাহলে হিসেব করুন দেখি সাড়ে তিন ঘণ্টায় কতো ভাড়া হয়?

ঠাট্টা করচিনে মশায়—মনের সে রকম প্রফুল্ল অবস্থা নয়। এ বাড়িতে নিমন্ত্রিত হ'য়ে আমি সাড়ে তিন ঘণ্টাকাল আছি। সে জন্যেও যদি ভাড়া দিতে হয় তো ন্যায্য হিসেব ক'রে নিন্!

আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বল্‌চেন? মাপ কর্‌বেন, ঐটি পারবো না। সাড়ে তিন ঘণ্টা ধ'রে পেটের জ্বালায় মর্‌চি, ঠিক যেই খাবারটি আস্‌বার সময় হলো অম্‌নি আপনি গাল দিচ্চেন বলেই যে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো আমাকে তেমন গর্দভ ঠাওরাবেন না!

উঃ বকে বকে আমার গলা শুকিয়ে এলো, আর তো বাঁচিনে! ক্ষিদেয় নাড়িগুলো বেবাক্ হজম হ'য়ে গেল! ঐ যে পায়ের শব্দ! ওহে উদয়, আমার অন্ধের নড়ি, আমার সাগর-সেঁচা সাত-রাজার-ধন-মাণিক, একবার উদয় হও হে! আর তো প্রাণ বাঁচে না!

আরে না মশায়—আপনাদের সম্ভাষণ করচি নে! আপনারা হঠাৎ চঞ্চল হবেন না। আমি পেটের জ্বালায় মনের খেদে আমার প্রাণের বন্ধুকে ডাক্‌চি। আপনারা বসুন!

আর ব'স্‌তে পারচেন না? অনেক দেরি হয়ে গেচে? সে কথা আর আমাকে বল্‌তে হবে না! দেরি হ'য়েচে সন্দেহ

নেই! তা হ'লে আপনাদের আর পীড়াপীড়ি ক'রে ধ'রে রাখ্‌তে চাইনে। তবে আজকের মতো আপনারা আসুন! আপনাদের সঙ্গে মিষ্টালাপে এতোক্ষণ সময়টা বেশ সুখে কাট্‌ছিলো!

ও বাবা! এরা যে সবাই মিলে মারধোর কর্‌বার জোগাড় করে! খালিপেটে ক্ষিধের উপর মার্‌টা সয় না দেখ্‌চি! আচ্ছা বাপু, তোমরা সবাই বোসো! তোমাদের কার কতো পাওনা আছে বলো। ভাগ্যি মাইনের টাকাটা পকেটে ছিল, নইলে আজ নিতান্তই ধনঞ্জয়কে স্মরণ ক'রে একপেট ক্ষিদে সুদ্ধ দৌড় মার্‌তে হতো! আপাতত প্রাণটা বাঁচাই, তারপর টাকাটা উদয়ের কাছ থেকে আদায় ক'রে নিলেই হবে!

তোমার পাঁচ টাকা বই পাওনা নয় কিন্তু তুমি পঞ্চান্ন টাকার গাল পেড়ে নিয়েচো বাপু—এই নাও তোমার টাকা!

ওহে বাপু, তোমার হোটেলের বিল এই শুধে দিচ্ছি, যদি কখনো অসময়ে তোমাদের শরণাগত হ'তে হয় তা' হ'লে স্মরণ রেখো!

তোমার তিনমাসের বাড়িভাড়া পাওনা? একমাসের টাকাটা আজ দিচ্চি বাকি পরে নিয়ো।

চন্দ্র, তুমি আবার হাত বাড়াও কেন হে? তোমাদের কল্যাণে যে রকম সস্তায় আজ নেমন্তন্ন খেয়ে গেলুম বহুকাল

আমার আর ক্ষিদে থাক্‌বে না! আরো কী চাও?

ও! বকশিষ্‌! সেটা চুকিয়ে দেওয়াই ভালো! যখন এতোই কর্‌লেম তখন সর্ব্বশেষে ঐ খুঁৎটুকু আর রাখবোনা। কিন্তু আমার কাছে আর একটিমাত্র টাকা বাকি আছে। তা'র মধ্যে বারো আনা আমি গাড়ি ভাড়ার জন্যে রেখে দিতে চাই। তোমার কাছে খুচরো যদি কিছু থাকে তা হ'লে ভাঙ্গিয়ে—

খুচরো নেই? (পকেট উল্টাইয়া শেষ টাকাটি দিয়া) তবে এই নাও বাপু, তোমাদের বাড়ি থেকে বেরোলুম একেবারে "গজভুক্ত কপিত্থবৎ।"

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাব ও অভাব

কবিবর কুঞ্জবিহারীবাবু ও বশম্বদবাবু

কুঞ্জ। কি অভিপ্রায়ে আগমন ?

বশ। আজ্ঞে, আর তো অন্ন জোটে না ; মশায় সেই যে কাজের—

কুঞ্জ। (ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া) কাজ ? কাজ আবার কিসের ? আজ এই সুমধুর শরৎকালে কাজের কথা কে বলে ?

বশ। আজ্ঞে, ইচ্ছে ক'রে কেউ বলে না, পেটের জ্বালায়—

কুঞ্জ। পেটের জ্বালা ? ছি ছি ওটা অতি হীন কথা—ও-কথা আর বল্‌বেন না।

বশ। যে আজ্ঞে, আর বল্‌ব না। কিন্তু ওটা সর্ব্বদাই মনে পড়ে ?

কুঞ্জ। বলেন কী বশম্বদবাবু, সর্ব্বদাই মনে পড়ে ? এমন প্রশান্ত নিস্তব্ধ সুন্দর সন্ধ্যাবেলাতেও মনে পড়্‌চে ?

বশ। আজ্ঞে, পড়্‌চে বই কি। এখন আরও বেশী মনে পড়্‌চে। সেই সাড়ে দশটা বেলায় দুটি ভাত মুখে গুঁজে উমেদারী কর্ত্তে বের হয়েছিলুম তারপরে তো আর খাওয়া হয়নি।

কুঞ্জ। তা না-ই হোলো। খাওয়া না-ই হোলো।

(বশম্বদবাবুর নীরবে মাথা চুল্‌কন)

কুঞ্জ। এই শরতের জ্যোৎস্নায় কি মনে হয় না যে, মানুষ যেন পশুর মত কতকগুলো আহার না ক'রেও বেঁচে

থাকে! যেন কেবল এই চাঁদের আলো, ফুলের মধু, বসন্তের বাতাস খেয়েই জীবন বেশ চলে যায়।

বশ। (সভয়ে মৃদুস্বরে) আজ্ঞে, জীবন বেশ চলে যায় সত্যি কিন্তু জীবন রক্ষে হয় না—আরও কিছু খাবার আবশ্যক করে;—

কুঞ্জ। (উষ্ণভাবে) তবে তাই খাওগে যাও! কেবল মুঠো মুঠো কতকগুলো ভাত ডাল আর চচ্চড়ি গেল গে যাও! এখানে তোমাদের অনধিকার প্রবেশ।

বশ। সেগুলো কোথায় পাওয়া যাবে মশায়! আমি এখনি যাচ্চি। (কুঞ্জবাবুকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতে দেখিয়া) কুঞ্জবাবু, আপনি ঠিক বলেচেন, আপনার এই বাগানের হাওয়া খেলেই পেট ভ'রে যায়। আর কিছু খেতে ইচ্ছা করে না.

কুঞ্জ। এ-কথা আপনার মুখে শুনে খুশি হলুম, এই হচ্চে যথার্থ মানুষের মতো কথা। চলুন, বাইরে চলুন; এমন বাগান থাকতে ঘরে কেন?

বশ। চলুন। (আপন মনে মৃদুস্বরে) হিমের সময়টা—গায়েও একখানা কাপড় নেই—

কুঞ্জ। বাঃ—শরৎকালের কী মাধুরী!

বশ। তা ঠিক কথা। কিন্তু কিছু ঠাণ্ডা।

কুঞ্জ। (গায়ে শাল টানিয়া) কিছু ঠাণ্ডা নয়।

বশ। না ঠাণ্ডা নয়! (হি হি হি কম্পন)

কুঞ্জ। (আকাশে চাহিয়া) বা বা বা দেখে চক্ষু জুড়ায়। খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘগুলি নীল আকাশের সরোবরে রাজহংসের মতো ভেসে বেড়াচ্চে আর মাঝখানে চাঁদ যেন—

বশ। (গুরুতর কাশি) খক্ খক্ খক্।

কুঞ্জ। মাঝখানে চাঁদ যেন—

বশ। খক্ খক্ খক্।

কুঞ্জ। (ঠেলা দিয়া) শুনচেন বশম্বদবাবু—মাঝ খানে চাঁদ যেন—

বশ। রসুন একটু—খক্ খক্ খন্ খন্ ঘড়্ ঘড়্।

কুঞ্জ। (চটিয়া উঠিয়া) আপনি অত্যন্ত বদ্ লোক। এরকম ক'রে যদি কাশতে হয় তো আপনি ঘরের কোণে গিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকুন। এমন বাগান—

বশ। (সভয়ে প্রাণপণে কাশি চাপিয়া) আজ্ঞে আমার আর কিছু নেই। (স্বগত) অর্থাৎ কম্বলও নেই কাঁথাও নেই।

কুঞ্জ। এই শোভা দেখে আমার একটি গান মনে পড়েচে। আমি গাই!

সু-উ-উন্দর উপবন বিকশিত তরু-উগণ মনোহর বকু—

বশ। (উৎকট হাঁচি) হ্যাচ্ছোঃ

কুঞ্জ। মনোহর বকু—

বশ। হ্যাঁচ্ছোঃ। হ্যাঁচ্ছোঃ—

কুঞ্জ। শুন্‌চেন? মনোহর বকু—

বশ। হ্যাঁচ্ছোঃ হ্যাঁচ্ছোঃ।

কুঞ্জ। বেরোও আমার বাগান থেকে—

বশ। রসুন হ্যাঁচ্ছোঃ।

কুঞ্জ। বেরোও এখেন থেকে—

বশ। এখনি বেরোচ্চি—আমার আর একদণ্ডও এ-বাগানে থাক্‌তে ইচ্ছে নেই—আমি না বেরোলে আমার মহাপ্রাণী বেরোবেন। হ্যাঁচ্ছোঃ। শরৎকালের মাধুরী আমার নাক চোক দিয়ে বেরোচ্চে। প্রাণটা সুদ্ধ হেঁচে ফেল্‌বার উপক্রম। হ্যাঁচ্ছোঃ হ্যাঁচ্ছোঃ—থক্ থক্। কিন্তু কুঞ্জবাবু সেই কাজটা হ্যাঁচ্ছোঃ।

(কুঞ্জবাবুর নীরবে শাল মুড়ি দিয়া আকাশের চাঁদের দিকে চাহিয়া থাকন)

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। খাবার এসেচে।

কুঞ্জ। দেরী কল্লি কেন? খাবার আন্‌তে দুঘণ্টা লাগে বুঝি?

(দ্রুত প্রস্থান)

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শরতের হিমালয়

যখন আকাশ নির্ম্মেঘ, যখন ধুল্কুলার সম্পর্ক মাত্র নাই, সেই সময়ে--সেই সুখের শরৎ সময়ে—কেহ হিমালয়ের মধুরিমা দেখিয়াছ কি? একদিকে সমস্ত হিন্দুস্থান শতযোজনব্যাপী মাঠের ন্যায়, একদিকে পর্ব্বতশ্রেণীর পর পর্ব্বতশ্রেণী, তাহার পর পর্ব্বতশ্রেণী, তাহার পরে—কত পরে বরফের পাহাড় দেখিয়াছ কি? সেই শ্বেত স্বচ্ছ বরফের উপর সূর্য্য কিরণ পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতেছে, বোধ হইতেছে যেন রাজপুত্রের আগমনে বিশাল নগরীসমূহ নানা দীপমালায় মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে, দেখিয়াছ কি? পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কেবল দেখিবে চূড়ার পর চূড়া, তাহার পর চূড়া, তাহার পর আবার চূড়া; শেষ নাই, বিরাম নাই, অনন্ত বলিলেও হয়। বর্ষা সম্প্রতি শেষ হইয়াছে, চারিদেকে ঝরণা হইতে ঝম্ ঝম্ রবে দুধের ফেণার মত সাদা জল বেগে পড়িতেছে, কোথাও তাহার উপর সূর্য্যের আলোকে রামধনু দেখা যাইতেছে, কোথাও কোন নির্ঝরিণী চির-অন্ধকার মধ্য দিয়া চিরকাল অলক্ষিতভাবে প্রবাহিত হইতেছে, কেহ দেখিতেছে না অথচ গতিরও বিরাম নাই। যেখানে ঝরণা সেইখানেই গাছপালা বন, আর যেখানে নাই, সেখানে ভীষণাকার প্রস্তর, কাছে গেলে বোধ হয় এখনিই ঘাড়ে আসিয়া পড়িবে। এখানে এই ভয়ানক উচ্চতা আবার পরক্ষণেই গভীর খদ; তাহার তলা কোথায়?—দেখা

যায় না, যদি দেখা যায়, দেখিবে একটি ক্ষুদ্র নদী চলিয়া যাইতেছে, উপলে উপলে জল লাফাইতেছে, নাচিতেছে, আর চলিতেছে। স্থানে স্থানে নীরস কঠিন তরুবর সহস্র বৎসরেরও অধিককাল কালের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছে, আর সেঁউতিলতা তাহাকে জড়াইয়া জড়াইয়া পাঁচশত বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া রহিয়াছে।

এই হিমালয় তুমি আজি যেমন দেখিতেছ, ইহা অনন্তকাল এইরূপ, অনন্তকাল ধরিয়া বরফের পাহাড় এইরূপই আছে, ঝরণা এইরূপই বহিতেছে, আকাশও এইরূপ গাঢ় নীল, সবই এইরূপ। শরতেও হিমালয়ের এমনই গম্ভীর অথচ মনোহর, ভয়ঙ্কর অথচ উন্মাদক সৌন্দর্য্য।

—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

অন্ধকারের রূপ

রাত্রির যে একটা রূপ আছে, তাহাকে যে পৃথিবীর গাছ-পালা, পাহাড়-পর্ব্বত, জল-মাটী, বন-জঙ্গল প্রভৃতি যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া, একান্ত করিয়া দেখা যায়, ইহা যেন এই আজ প্রথম চোখে পড়িল। চাহিয়া দেখি, অন্তহীন কালো আকাশতলে পৃথিবী-জোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিত চক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্ব-চরাচর মুখ বুজিয়া, নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া, অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে। হঠাৎ চোখের উপর যেন সৌন্দর্য্য-তরঙ্গ খেলিয়া গেল। মনে হইল, কোন্ মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে—আলোরই রূপ, আঁধারের রূপ নাই? এত বড় ফাঁকি মানুষ কেমন করিয়া নীরবে মানিয়া লইয়াছে? এই যে আকাশ-বাতাস, স্বর্গ-মর্ত্ত্য পরিব্যাপ্ত করিয়া দৃষ্টির অন্তরে বাহিরে আঁধারের প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, মরি! মরি! এমন অপরূপ রূপের প্রস্রবণ আর কবে দেখিয়াছি! এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত সীমাহীন—তাহা ততই অন্ধকার। অগাধ বারিধি মসিকৃষ্ণ; অগম্য গহন অরণ্যানী আঁধার; সর্ব্বলোকাশ্রয়, আলোর আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্য্যের প্রাণপুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার! কিন্তু সে কি রূপের অভাবে? যাহাকে বুঝি না, জানি না,—যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখি না—তাহাই তত অন্ধকার! মৃত্যু তাই

মানুষের চোখে এত কালো, তাই তার পরলোকের পথ এমন দুস্তর আঁধারে মগ্ন! তাই রাধার দু'চক্ষু ভরিয়া যে রূপ প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়া দিল, তাহাও ঘনশ্যাম! কখনও এ সকল কথা ভাবি নাই; কোন দিন এ পথে চলি নাই; তবুও কেমন করিয়া জানি না, এই ভয়াকীর্ণ মহাশ্মশান-প্রান্তে বসিয়া নিজের এই নিরুপায় নিঃসঙ্গ একাকীত্বকে অতিক্রম করিয়া আজ হৃদয় ভরিয়া একটা অকারণ রূপের আনন্দ খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল; এবং অকস্মাৎ মনে হইল, কালোর যে এত রূপ ছিল, সে ত কোন দিন জানি নাই। তবে হয় ত মৃত্যুও কালো বলিয়া কুৎসিত নয়; একদিন যখন সে আমাকে দেখা দিতে আসিবে, তখন হয় ত তার এম্‌নি অফুরন্ত সুন্দর রূপে আমার দু'চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে। আর সে দেখার দিন যদি আজই আসিয়া থাকে, তবে, হে আমার কালো! হে আমার অভ্যগ্র পদধ্বনি! হে আমার সর্ব্ব-দুঃখ-ভয়-ব্যথাহারী অনন্ত সুন্দর! তুমি তোমার অনাদি আঁধারে সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া আমার এই দুটি চোখের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ হও, আমি তোমার এই অন্ধতমসাবৃত নির্জ্জন মৃত্যু-মন্দিরের দ্বারে তোমাকে নির্ভয়ে বরণ করিয়া মহানন্দে তোমার অনুসরণ করি।

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সখের থিয়েটার

দত্তদের বাড়ীতে কালীপূজা উপলক্ষে পাড়ার সখের থিয়েটারের ষ্টেজ বাঁধা হইতেছে। মেঘনাদবধ হইবে। ইতি-পূর্ব্বে পাড়াগাঁয়ে যাত্রা অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু থিয়েটার বেশী চোখে দেখি নাই। ষ্টেজ বাঁধায় সাহায্য করিতে পাইয়া একেবারে কৃতার্থ হইয়া গিয়াছি। শুধু তাই নয়। যিনি রাম সাজিবেন, স্বয়ং তিনি সেদিন আমাকে একটা দড়ি ধরিতে বলিয়াছিলেন। সুতরাং ভারি আশা করিয়াছিলাম, রাত্রে ছেলেরা যখন কানাতের ছেঁদা দিয়া গ্রীণরুমের মধ্যে উঁকি মারিতে গিয়া লাঠির খোঁচা খাইবে, আমি তখন শ্রীরামের কৃপায় বাঁচিয়া যাইব। হয় ত বা আমাকে দেখিলে এক আধবার ভিতরে যাইতেও দিবেন। কিন্তু হায় রে দুর্ভাগ্য! সমস্ত দিন যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিলাম, সন্ধ্যার পর আর তাহার কোন পুরস্কারই পাইলাম না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গ্রীণরুমের দ্বারের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলাম, রামচন্দ্র কতবার আসিলেন গেলেন; আমাকে কিন্তু চিনিতেও পারিলেন না! একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না, আমি অমন করিয়া দাঁড়াইয়া কেন? অকৃতজ্ঞ রাম! দড়ি ধরার প্রয়োজনও কি তাঁহার একেবারেই শেষ হইয়া গেছে!

রাত্রি দশটার পর থিয়েটারের পয়লা বেল হইয়া গেলে নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে সমস্ত ব্যাপারটার উপরেই হতশ্রদ্ধ হইয়া

সুমুখে আসিয়া একটা জায়গা দখল করিয়া বসিলাম। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই সমস্ত দুঃখ অভিমান ভুলিয়া গেলাম। সে কি প্লে! জীবনে অনেক প্লে দেখিয়াছি বটে, কিন্তু তেমনটি আর দেখিলাম না। মেঘনাদ স্বয়ং এক বিপর্যায় কাণ্ড! তাঁহার ছয়-হাত উঁচু দেহ। পেটের ঘেরটা চার-সাড়ে-চার হাত। সবাই বলিত, মরিলে গরুর গাড়ী ছাড়া উপায় নাই। অনেক দিনের কথা। আমার সমস্ত ঘটনা মনে নাই। কিন্তু এটা মনে আছে, তিনি সে দিন যে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমাদের দেশের হারাণ পলসাই, ভীম সাজিয়া মস্ত একটা সজিনার ডাল ঘাড়ে করিয়া দাঁত কিড়্‌মিড়্ করিয়াও তেমনটি করিতে পারিতেন না।

ড্রপ্-সিন্ উঠিয়াছে। বোধ করি বা তিনি লক্ষ্মণই হইবেন—অল্প-স্বল্প বীরত্ব প্রকাশ করিতেছেন। এম্‌নি সময়ে সেই মেঘনাদ কোথা হইতে একেবারে লাফ দিয়া সুমুখে আসিয়া পড়িল। সমস্ত ষ্টেজটা মড়-মড় করিয়া কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল—ফুট্-লাইটের গোটা-পাঁচ-ছয় ল্যাম্প উল্টাইয়া নিবিয়া গেল—এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিজের পেট-বাঁধা জরির কোমরবন্ধটা পটাস্ করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িল। একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল! তাঁহাকে বসিয়া পড়িবার জন্য কেহ বা সভয় চীৎকারে অনুনয় করিয়া উঠিল, কেহ বা সিন্ ফেলিয়া দিবার জন্য চেঁচাইতে লাগিল—

কিন্তু বাহাদুর মেঘনাদ কাহারও কোনও কথায় বিচলিত হইলেন না। বাঁ হাতের ধনুক ফেলিয়া দিয়া, পেণ্টুলানের মুট চাপিয়া ডান হাতের শুধু তীর দিয়াই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ধন্য বীর! ধন্য বীরত্ব! অনেকে অনেক প্রকার যুদ্ধ দেখিয়াছে মানি, কিন্তু, ধনুক নাই, বাঁ হাতের অবস্থাও যুদ্ধক্ষেত্রের অনুকূল নয়—শুধু ডান হাত এবং শুধু তীর দিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ কে কবে দেখিয়াছে! অবশেষে তাহাতেই জিত! বিপক্ষকে সে যাত্রা পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইল।

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চাণক্যের অভীষ্টসিদ্ধি

স্থান—সেতুপার্শ্বস্থ অরণ্য। কাল—সন্ধ্যা।

চাণক্য একাকী

চাণক্য—ক্ষুধিত লেলিহান কুক্কুরদের যুদ্ধক্ষেত্রে ছেড়ে দিয়েছি। এখন তা'রা স্বচ্ছন্দে এই প্রবাহিত ভৈরব-রক্তধারা পান করুক। এই নিবিড় অরণ্যে ব্যাঘ্র ভল্লুকের অভাব আজ তারাই পূর্ণ কর্চ্ছে। তফাৎ এই যে, ব্যাঘ্র ভল্লুক উদরের জন্য অনন্যোপায় হ'য়ে মানুষের রক্ত শোষণ করে। আর মানুষ লোভে, অন্ধ-হিংসায় টুঁটি কামড়ে ধরে। বলিহারি সৃষ্টি!—ঐ সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। দিবার চিতাগ্নি তা'র চারিদিকে ধূ ধূ ক'রে জ্বলে উঠেছে! কাল আবার ঐ সূর্য্য উঠ্‌বে! উঠুক। একদিন আস্‌বে, যে দিন ঐ সূর্য্য আর উঠ্‌বে না। ঐ জ্যোতিঃ ক্রমে ক্রমে শীর্ণ, মলিন, ধূসর হ'য়ে যাবে। তা'র পাংশু রক্তবর্ণ ধূম পৃথিবীর পাণ্ডুর মুখের উপর এসে পড়্‌বে। তারপর তাও পড়্‌বে না। কৃষ্ণ-সূর্য্য অনন্ত-শূন্যে অদৃশ্য হ'য়ে যাবে। কি গরিমাময় দৃশ্য সেই!—কে?

[কাত্যায়নের প্রবেশ]

চাণক্য—কাত্যায়ন? কি সংবাদ?

কাত্যায়ন—আমাদের যুদ্ধে পরাজয় হ'য়েছে।

চাণক্য—পরাজয়!

কাত্যায়ণ—চন্দ্রগুপ্ত পলায়িত! তাই দেখে আমাদের সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়েছে।

চাণক্য—চন্দ্রগুপ্ত পলায়িত!—কোথায়?

কাত্যায়ন—পূর্ব্বদিকে।

চাণক্য—যা আশঙ্কা করেছিলাম!—চন্দ্রকেতু কোথায়?

কাত্যায়ন—তা জানি না। তবে আমি তাকে অশ্ব থেকে প'ড়ে যেতে দেখেছি।

চাণক্য—তুমি এতক্ষণ কি কর্চ্ছিলে মূর্খ?

কাত্যায়ন—আমি ঐ পর্ব্বতশিখরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের গতি নিরীক্ষণ কর্চ্ছিলাম।

চাণক্য—নিরীক্ষণ কর্চ্ছিলে!—যখন জয় নিশ্চিত, মুষ্টিগত!
—ওঃ!

কাত্যায়ন—ঐ যে। চন্দ্রগুপ্ত আস্‌ছে।

চাণক্য—(সাগ্রহে) কৈ? (করতালি দিয়া) ঐ যে! এখনও আশা আছে। কাত্যায়ন! তুমি সৈন্যদের আশ্বাস দাও। বল চন্দ্রগুপ্ত আস্‌ছে, পালায় নি,—যাও, শীঘ্র যাও,—দ্বিরুক্তি কোরো না।

[কাত্যায়নের প্রস্থান]

চাণক্য—চিন্তা নাই! 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্'! মূরা! মূরা!

[মূরার প্রবেশ]

মূরা—কি গুরুদেব!

চাণক্য—এইখানে দাঁড়াও। (দাঁড় করাইয়া) কাঁদতে জানো নারী?

মূরা—সে কি!

চাণক্য—ঐ চন্দ্রগুপ্ত আস্‌ছে। তোমায় কাঁদ্‌তে হবে।

মূরা—পুত্র! পুত্র! (অগ্রসর হওন)

চাণক্য—খবর্দ্দার! এখন স্নেহ নয়—তিক্ত ভৎ᾽সনা। উষ্ণ অশ্রুজল, পুত্রের উপর মাতার অভিমান, অভিনয় কর্ত্তে হবে।—প্রস্তুত?

[ধীরে ধীরে মুক্ত তরবারি হস্তে নতমুখে চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ]

চাণক্য—এই যে চন্দ্রগুপ্ত!—চন্দ্রগুপ্ত যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে এসেছে মূরা!—তাকে তোমার বক্ষে নাও। বীরপুত্র তোমার—উৎসব কর।

চন্দ্রগুপ্ত—না গুরুদেব! আমি জয়লাভ ক'রে আসি নি।

চাণক্য—সে কি!—তবে!

চন্দ্রগুপ্ত—আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসেছি।

চাণক্য—সে কি! অসম্ভব! মূরার পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করে কিংবা প্রাণ দেয়, পালায় না।

মূরা—পালিয়ে এসেছো!—স্থিরচিত্তে এ কথা বল্‌ছো চন্দ্রগুপ্ত! পালিয়ে এসেছো! মর্ত্তে পারো নি?—ভীরু!

চাণক্য—না, এ ক্ষণিক দৌর্ব্বল্য।—যাও, যুদ্ধ কর চন্দ্রগুপ্ত।

চন্দ্রগুপ্ত—পার্ব্ব না! (তরবারি পদতলে রাখিলেন)

চাণক্য—কি পার্ব্বে না?

চন্দ্রগুপ্ত—ভাইয়ের গায়ে অস্ত্রাঘাত কর্ত্তে।

মূরা—কাপুরুষ!

চন্দ্রগুপ্ত—কাপুরুষ নই—ভাই।

চাণক্য—যে ভাই তোমাকে নির্ব্বাসিত ক'রেছে!

চন্দ্রগুপ্ত—তবু সে ভাই।

মূরা—যে ভাই তোমার মাতাকে অপমান ক'রেছে!—কি, নীরব রৈলে যে?

চাণক্য—যা'র রাজত্ব দৌরাত্ম্যের নামান্তর মাত্র!

চন্দ্রগুপ্ত—গুরুদেব! ভ্রাতৃবিরোধে কি আপনি আজ্ঞা দেন?

চাণক্য—হাঁ—ধর্ম্মযুদ্ধে! কুরুক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি ব'লেছিলেন?

চন্দ্রগুপ্ত—মার্জ্জনা কর্ব্বেন গুরুদেব! শ্রীকৃষ্ণের যুক্তি আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে না।

চাণক্য—(সপদদাপে) এই পাপেই আর্য্যাবর্ত্ত গেল। চন্দ্রগুপ্ত! গীতার মাহাত্ম্য তুমি কি বুঝ্বে?—শাস্ত্রচর্চ্চা ব্রাহ্মণের অধিকার।

চন্দ্রগুপ্ত—ব্রাহ্মণের অধিকার ব্রাহ্মণ ভোগ করুন। আমায় বিদায় দিন।

চাণক্য—চন্দ্রগুপ্ত! তোমার এই দৌর্ব্বল্য আমি মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছি। অন্য সময়ে এই দৌর্ব্বল্য যায় আসে না। শুষ্ক নৈরাশ্যে অলস প্রহর যাপন কর, উষ্ণ অশ্রুজলে নৈশ উপাধান অভিষিক্ত কর,—যায় আসে না। সময় সময় ক্রন্দনও বিলাস। কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এ দৌর্ব্বল্য সাংঘাতিক। ভূমিকম্পের মত উঠে, সে নিমেষে শতাব্দীর রচনা ভূমিসাৎ করে। চন্দ্রগুপ্ত! মূহূর্ত্তে জীবনের সাধনা নিষ্ফল ক'রে দিও না। জীর্ণ বস্ত্রসম এই আলস্য হৃদয় থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। যুদ্ধে অগ্রসর হও।

চন্দ্রগুপ্ত—মার্জ্জনা কর্ব্বেন গুরুদেব!

মূরা—চন্দ্রগুপ্ত। সত্যই কি আমার পুত্র তুমি!!! যে নন্দ—

চন্দ্রগুপ্ত—তাকে মার্জ্জনা কর মা।

মূরা—মার্জ্জনা। সর্ব্বাঙ্গে দিবারাত্র শত বৃশ্চিকের দংশনের জ্বালাকে শীতল কর্ত্তে পারে এক—নন্দের রক্ত!

চন্দ্রগুপ্ত—মা, শৈশবে কত তার সঙ্গে খেলা করেছি; তাকে কত খেলনা কিনে দিয়েছি; তোমার কাছে মিষ্টান্ন পেয়ে তার আধখানি ভেঙে নন্দকে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছি; পিতার তিরস্কারে তার ছলছল চক্ষুদু'টি চুম্বন ক'রে অশ্রু মুছিয়ে দিয়েছি! একদিন

এক পলাতক অশ্ব ছুটে যাচ্ছিল, নন্দ সম্মুখে পড়েছিল, তার আসন্ন বিপদ্ দেখে আমি তাকে বক্ষ দিয়ে ঘিরে অশ্বের পদাঘাত নিজের পিঠ পেতে নিয়েছিলাম। আজ যুদ্ধক্ষেত্রে আবার সেই কোমল তরুণ ঢল ঢল মুখখানি দেখ্লাম, আর সেই সব কথা একসঙ্গে মনে প'ড়ে গেল। তা'র মাথার উপর খড়্গ উঠাতে আমার পিতৃরক্ত হৃৎপিণ্ডে লাফিয়ে উঠে পঞ্জরের দ্বারে সবলে আঘাত ক'রে চেঁচিয়ে উঠ্লো "সাবধান চন্দ্রগুপ্ত! ও ভাই!—মগধের সাম্রাজ্য কি ভাইয়ের চেয়ে বড়?"

মূরা—নন্দ তোমার ভাই। কিন্তু আমার কে?

চন্দ্রগুপ্ত—নন্দ তোমার পুত্র। মা! গর্ভে ধারণ না কর্লে কি পুত্র হয় না? নন্দের মাতার মৃত্যুর পর তার মাতৃস্বরূপিণী হ'য়ে তুমি তাকে মানুষ কর নি? স্তন্যপান করাও নি? বুকে ক'রে ঘুম পাড়াও নি?

মূরা—সেই জন্যই ত ক্ষমা কর্ত্তে পারি না। সে সব কথা নন্দ ভুলে যেতে পারে আমি পারি না।—যখন অধম বাচাল আমার কেশ আকর্ষণ কল্লে'।—আর নন্দ শূদ্রাণী মা বলে' ব্যঙ্গ কর্লে—তখন কি বল্বো পুত্র—ওঃ।—তোমার কাছে মাতার অপমান কি কিছুই

নয় ? মা তোমার কেউ নয় ?

চাণক্য—এক মাতৃগর্ভে জন্ম ব'লেই ভাইয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ না ? মায়ের চেয়ে ভাই বড় ? জগতে এই প্রথম হ'ল যে, সন্তান মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নেয় না !—(মূরাকে) কাঁদো অভাগিনী নারী ! এই তোমার পুত্র ! মা চিনে না।—জানে না যে জগতে যত পবিত্র জিনিস আছে, মায়ের কাছে কেউ নয়।

চন্দ্রগুপ্ত—তা জানি গুরুদেব।

চাণক্য—না জানো না। নইলে মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতে সন্তান দ্বিধা করে ! মা—যার সঙ্গে একদিন এক অঙ্গ ছিলে—এক প্রাণ, এক মন, এক নিশ্বাস, এক আত্মা—যেমন সৃষ্টি একদিন বিষ্ণুর যোগনিদ্রায় অভিভূত ছিল ; তার পর, পৃথক হ'য়ে এলো—অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মত, সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার মত, চিরন্তন প্রহেলিকার প্রশ্নের মত ; মা—যে তার দেহের রক্ত নিংড়ে, নিভৃতে, বক্ষের কটাহে চড়িয়ে, স্নেহের উত্তাপে জ্বাল দিয়ে সুধা তৈরী ক'রে তোমায় পান করিয়েছিল, যে তোমার অধরে হাস্য দিয়েছিল, রসনায় ভাষা দিয়েছিল, ললাটে আশীষ-চুম্বন দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিল ; মা—রোগে, শোকে, দৈন্যে, দুর্দ্দিনে

তোমার দুঃখ যে নিজের বক্ষ পেতে নিতে পারে, যার স্বচ্ছ স্নেহমন্দাকিণী এই শুষ্ক তপ্ত মরুভূমিতে শতধারায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে যাচ্চে ; মা—যার অপার শুভ্র করুণা মানব জীবনে প্রভাত সূর্য্যের মত কিরণ দেয়—বিতরণে কার্পণ্য করে না, বিচার করে না, প্রতিদান চায় না, উন্মুক্ত উদার, কম্পিত আগ্রহে দু'হাতে আপনাকে বিলাতে চায় ;—এ সেই মা !

চন্দ্রগুপ্ত—গুরুদেব ! রক্ষা করুন, আমায় ভ্রাতৃবধে উত্তেজিত কর্ব্বেন না।

মূরা—চন্দ্রগুপ্ত ! এতদিনে বুঝ্‌লাম যে, আমি তোমার কেউ নই ! নন্দ ক্ষত্রিয়, তুমি ক্ষত্রিয় কুমার। নন্দই তোমার ভাই। আমি শূদ্রাণী। আমি তোমায় গর্ভে ধারণ করেছিলাম মাত্র। আমি কে ! আমি ত তোমার মা নই !

চন্দ্রগুপ্ত—পুত্রের উপর তুমি এত নিষ্ঠুর হ'তে পারো মা ! তুমি আমার মা নও ! তুমি শুদ্ধ আমার মা নও,— তুমি আমার ধর্ম্ম, তুমি আমার সাধনা, তুমি আমার ঈশ্বর। তোমার আজ্ঞা আমার কাছে দৈববাণী।

মূরা—তাই যদি সত্য হয়, তবে যুদ্ধে অগ্রসর হও। —কি ! তথাপি নীরব !—চন্দ্রগুপ্ত ! (ভগ্নস্বরে) আমি তোমার

মা, তোমার অপমানিত প্রপীড়িত পদাহত মা।
এই আমার আজ্ঞা!—এখন তোমার যেরূপ অভিরুচি।

চন্দ্রগুপ্ত—তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। আর দ্বিধা নাই। তোমার আজ্ঞাই এই প্রশ্নসঙ্কুল কুটিল জগতে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাক্। আমি যেন তোমাকেই জীবনের ধ্রুবতারা ক'রে পার্শ্বে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সংসার-সমুদ্রে তরী বেয়ে চ'লে যাই।—মা আশীর্ব্বাদ কর। এই মুহূর্ত্তে আমি যুদ্ধে যাচ্ছি।

মুরা—এই ত আমার পুত্র।

চাণক্য—এই ত আমার শিষ্য। এই ক্ষণিক অবসাদ তোমার প্রাণ থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

জন্মভূমি

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী!"

অভাগিনী জন্মভূমির মুখের পানে চাহিয়া জড়-হৃদয় পাষাণ কাঁদিয়া ফেলে, কিন্তু সেই শ্যামল স্নেহে চির-বৰ্দ্ধিত সন্তানের কোমল হৃদয় ত কাঁদে না। শ্যামলা জননীর প্রস্ফুটিত হাসি-মুখ আমরা আর দেখিব না, জননীর হৃদয় শোষণ করিয়া মৃত্যু চলিয়া গিয়াছে। সে বিকশিত প্রাণ ম্লান হইয়া পড়িয়াছে; তাহার চারি পার্শ্বে আজ রোগ, শোক, জরা, অন্ধকার পিশাচের রুধিরোন্মত্ত চীৎকার, বেদনা-কাতর মুমূর্ষুর হাহাকার বিলাপ। নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দুর্ব্বলের বল, শান্তিনিকেতন মাতৃক্রোড়ে অরণ্যের পশু ঘর বাঁধিয়াছে; রৌদ্রপীড়িত ক্ষুধাকাতর সন্তানেরা প্রবৃত্তির ছলনায় পরস্পরকে বঞ্চিত করিয়া অসীম সুখ লাভ করিতেছে—দরিদ্রা মায়ের কথা হৃদয়ে আর ঠাঁই পায় না। আজি একবার আত্মবিচ্ছেদ ভুলিয়া, উচ্চনীচ অভিমান ভুলিয়া, এক হৃদয়ে যদি আমরা মায়ের পূজা করিতে পারি, কাল প্রভাত-কিরণে হাসিমুখে অন্নপূর্ণা অন্ন ঢালিয়া দিবেন—ক্ষুধার যন্ত্রণা আর সহিতে হইবে না। জননী জন্মভূমির শুষ্ক হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে; সে হৃদয়োচ্ছ্বাসে যে অমৃত ঝরিবে পান করিয়া তাহা কেহ নিঃশেষ করিতে পারিবে না। এ রক্তের নদী বহিবে না, এ কঙ্কালের স্তূপ জমিবে না। হিমাচল-নিঃসৃতা শান্তিবারি পান করিয়া পৃথিবী শীতল হইবে।

জন্মভূমি জননীর সম্মানেই আমাদের সম্মান, জন্মভূমির শ্রীবৃদ্ধি-তেই আমাদের শ্রীবৃদ্ধি। আমরা যখন জননীকে ভক্তি করিতে শিখিব, অপরে তখন তাঁহাকে তাচ্ছিল্য করিতে সাহস করিবে না। সেদিন প্রভাতে জগৎ স্তম্ভিত হইয়া শুনিবে ভারতবর্ষের বুকের মধ্য হইতে একসুরে মায়ের নাম উঠিতেছে—সন্তানেরা মা বৈ আর জানে না, মায়ের নামে সকলেই এক। সেদিন কলহ বিবাদ থাকিবে না, সমস্ত পৃথিবীকে আমরা ভায়ের মত আলিঙ্গন করিতে পারিব—পৃথিবী আমাদের নিকট সরিয়া আসিবে।

আজ একবার মায়ের মুখের পানে চাহিয়া দেখ, আপনাদের দারিদ্র্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। মায়ের করুণ আঁখির পানে একবার চাহিয়া দেখ, হৃদয় পুলকে পূরিয়া উঠিবে। ঐ স্নেহ-মধুর অধরে আজ কেন বিষাদের রেখা ফুটিয়াছে, ঐ পবিত্র সৌন্দর্য্যে শোকের ছায়া পড়িয়াছে। সে শুভ্র উষার মত কান্তি ম্লান, সে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তি বিষণ্ণা। অন্নপূর্ণার অন্ন সন্তানেরা আর দেখিতে পায় না! অবনত মুখে জননী সন্তানের দুর্দ্দশা দেখিয়া চোখের জল মুছিতেছেন। দুর্ব্বল সন্তানের দুর্দ্দশা দেখিয়া জননীর চোখের জল ভিন্ন দিবার আর আছে কি! সন্তানেরা আপনার মধ্যেই কলহ করিতেছে; ভাইকে বঞ্চিত করিয়া ভাই বড় হইতে চায়। ন্যায়ের পথে না চলিলে এখন

আর উপায় নাই—সমূলে বিনষ্ট হইতে হইবে। জন্মভূমি! ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবি ভারতি! দুর্ব্বল সন্তানের হৃদয় তোমার পবিত্র ভাবে পূর্ণ কর। সেখানে মহত্ত্বের বীজ অর্পণ কর মা, অনৈকতা একতায় পরিণত হোক। মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে সন্তান যেন পশ্চাৎপদ না হয়।

অতীত স্মৃতির স্বপ্নে ভোর হইয়া ঘরের কোণে কানাকানি করিলে চলিবে না, মায়ের পূজা করিতে হইবে। ভীষ্ম-দ্রোণের নাম লইলে হইবে না, হৃদয়ের মধ্যে তাঁহাদের প্রভাব অনুভব করা চাই। ভগবানের নামে বাধাবিপত্তি কাটিয়া যাইবে। ভারতবর্ষের শূন্য মন্দিরে আমরা পুনরায় মায়ের প্রতিষ্ঠা করিব। চারিদিক হইতে এখানে লোকে মাতৃভক্তি শিখিতে আসিবে। এখানে আসিয়া সকলে স্বাধীনতা শিক্ষা করিবে—নরহত্যা শিখিবে না। শিখিবে, মায়ের সেবা করিতে; শিখিবে, সত্যের সম্মান রাখিতে। ভারতীর বীণাধ্বনি জগতে ব্যাপ্ত হইবে। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের নামে শত শত উন্নত শির নত হইয়া থাকিবে। আমাদের গৃহে সেদিন মায়ের প্রতিষ্ঠা।

—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রাত্রির-রূপ

তুমি কখনও রাত্রি জাগিয়াছ কি? দিনমণির অস্তগমন হইতে দিনমণির পুনরুদয় পর্য্যন্ত সেই যে এক দৃশ্য,—কখনও গাঢ় গভীর অন্ধকার, কখনও অন্ধকারে ঢাকা অস্ফুট ও বিষণ্ণ আলো, কখনও বা অন্ধকার ও আলোকের আনন্দময় মিশ্রণ-জনিত সেই যে এক অনির্ব্বচনীয় আভা, তাহা কোন সময়েও আবিষ্ট চিত্তে প্রত্যক্ষ করিয়াছ কি? যদি না করিয়া থাক, তবে কিছুই কর নাই; প্রকৃতির এই লীলাময় মায়াকাননে যাহা দেখিবার আছে, তাহা দেখ নাই; যাহা শুনিবার আছে, তাহাও বোধ হয় শুনিতে পাও নাই।

দিবসেও এই পৃথিবী, এবং রাত্রিতেও এই পৃথিবী; এই অদ্রি, এই উদ্যান, এই সরোবর, এই নগর, এই গ্রাম, এই প্রান্তর, সমস্তই এই, কিন্তু তথাপি দিবা রাত্রি সমান নহে। দিবসের পৃথিবী মনুষ্যের। রাত্রির পৃথিবী কাহার তাহা জানি না; অন্ততঃ মনুষ্যের নহে, একথায় আর সংশয় নাই। দিবসে ক্ষুধা তৃষ্ণা, সূর্য্যের খরজ্যোতিঃ, বিষয়-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, আঘাত প্রতিঘাত, নিয়ত-ঘূর্ণমান সংসার-চক্রের শ্রুতি-কঠোর ঘর্ঘর রব এবং লোকালয়ের হলহলা। রাত্রিতে জগতীর নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্য এবং নিদ্রিত সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব ভাব।

একবার ভাবি, রাত্রিই জগদাবরণভূতা জগদ্ধাত্রী বিশ্ব-জননী। শুনিয়াছি, পুরাতন বৈদিক মহর্ষিগণও এইরূপেই

উঁহার বন্দনা করিয়াছেন। যেমন শিশু সন্ধ্যার সমাগম হইলেই প্রসূতির ক্রোড়ে লুক্কায়িত হইবার জন্ম আকুল হয়, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডস্থ প্রাণিবর্গও সেইরূপ দিবালোকের অদর্শন হইলেই রাত্রির স্নেহ-রস-পূর্ণ অনস্ত ক্রোড়ে আশ্রয় লইবার জন্ম ব্যাকুল হইয়া পড়ে। মেদিনী তখন কি আনন্দের অব্যক্ত মধুর নাদেই না মুহূর্ত্তকাল নিনাদিত হয়! ব্যবসায়ী সহাস্যবদনে ব্যবসায় কার্য্য স্থগিত রাখে; কৃষক সমস্ত দিবসের পরিশ্রমের পর, পশুপাল সঙ্গে লইয়া, মনের সুখে গাহিতে গাহিতে, গৃহাভিমুখে প্রধাবিত হয়; বিটপীর কল-কোলাহলে দশদিক্ বাজিয়া উঠে; পার্থিব ক্রিয়া-কর্ম্মের প্রবল প্রবাহ নিরুদ্ধ হইয়া আসে, দেখিতে দেখিতেই সকল একাকার হইয়া যায়, এবং যেখানে যে আছে সকলেই সেই এক শয্যায় শয়ন করিয়া কৃতার্থতা লাভ করে। ইহা মাতৃস্নেহের উপর মুগ্ধ নির্ভর ভিন্ন আর কি হইতে পারে? রাজা প্রজা, দাতা, গৃহীতা, অপকারী, অপকৃত, নিন্দুক, নিন্দিত, পূজ্য, পূজক, ভক্ষ্য, ভক্ষক, কেহই সেই অতুল স্নেহের সুখ-শয্যায় বঞ্চিত নহে। তাপহারিণী, দুঃখবারিণী, করুণাময়ী জননী, সকলকেই সমান আদরে বুকে লইয়া সকলের দুঃখ তাপ বিদূরিত করেন! যে দিনান্তে মুষ্টিভিক্ষাও আহরণ করিতে পারে নাই, তাহাকেও ক্রোড়ে লন, এবং যে অসীম ঐশ্বর্য্যের অধিস্বামী হইয়াও সমস্ত দিবসে এক মুষ্টি তণ্ডুল তুলিয়া ভিখারীকে দিতে

সমর্থ হয় নাই, তাহাকেও আশ্রয় দান করেন। যে ব্যক্তি আপনটি বই জগতে আর কাহাকেও আপনার বলিয়া মনে করে না, কাহারও সুখ দুঃখের কোন সংবাদ লয় না,—শত রক্ষকে পরিরক্ষিত রহিয়াও চিত্তে আশ্বাস পায় না সেও মা নক্ষত্রকুন্তলার পদপ্রান্তে আপনার দেহপ্রাণ সমর্পণ করিয়া ক্ষণকাল নয়ন মুদিয়া নিশ্চিন্ত থাকে। আর যে আপনার একটা প্রাণকে শত সহস্র প্রাণে বিলাইয়া দিয়াও তৃপ্তি লাভ করে না, যাহার অমলা প্রীতি পাপী-তাপী, পীড়িত পাষণ্ড, কাহাকেও ঘৃণা করিতে জানে না,—যাহার অফুরন্ত ভালবাসা আষাঢ়ের অজস্রধারায় কৃষ্ট হইয়াও নিঃশেষ হয় না, সেও নৈশ-শান্তির আনন্দময় আবেশে, তাহার হৃদয়ের প্রস্রবন রুদ্ধ করিয়া, সকলকেই কিছু সময়ের জন্য একবারে পাসরিয়া রহে। রাত্রি জীবের মাতৃস্থানীয়া নয় ত কি? মাতার ক্রোড় বিনা; এমন শীতল, এমন কোমল, এমন শান্তির স্থান ত্রিভুবনে আর কোথায় সম্ভবে?

—কালীপ্রসন্ন ঘোষ